ভাঁটফুলসূত্র

বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০২ | আশ্বিন ১৪২৭ | সেপ্টেম্বর ২০২০

ই-সাময়িকী, বর্ষ ০১, সংখ্যা ০২
আশ্বিন, ১৪২৭, সেপ্টেম্বর, ২০২০

মূল কারিগর
আমান উল্লাহ, বদরুজ্জামান আলমগীর, হিরন্ময় চন্দ, মনিরা রহমান মিঠি, রফিক জিবরান, রুবাইয়াত রিক্তা, সাদাত সায়েম

bhatphulsutra@gmail.com

শিল্পনির্দেশনা ও অঙ্গসজ্জা:
হিরন্ময় চন্দ

স্মরণ অংশের চিত্রকর্মসমূহ শিল্পী আব্দুস সালামের আঁকা

প্রচ্ছদ:
শিল্পী আব্দুস সালামের চিত্র 'মিউজিক' অবলম্বনে

: ভাঁটফুলসূত্র

ভাঁটফুল
১১৯/২, উপশহর, রাজশাহী, বাংলাদেশ
ই-মেইল: bhatphul@outlook.com
ওয়েবসাইট: www.bhatphul.com

কে-যে কোন পথে, পৃথিবীর পথে পথে কেমন চিহ্ন এঁকে যায়- কী সন্ধানে তার খবর জানি! একজন মজুর, একজন পানবিক্রেতা কিংবা একজন কবি, লেখক বা ছবি আঁকিয়ে– একই সমান্তরালে ভিন্ন ভিন্ন সময় বাস্তবতা কী পরাবাস্তবতায় নিজস্ব জগৎ বিনির্মাণ করেন, তাকে পুনঃসৃজনে বাঁধেন, গড়েন ভাঙেন– এক অন্তহীন পথ চলায় একজন আব্দুস সালাম, শিল্পী, ভাবুক– রুক্ষ প্রান্তরেও রঙের আলপনা আঁকেন, সময়কে অতিক্রম করে বোধের অতীত এক বোধের দুনিয়ায়, জীবনের অলাতচক্রে হৃদচিহ্ন বোনার সারাৎসার খোঁজেন।

আমরা ভাঁটফুলসূত্র দ্বিতীয় সংখ্যা– অতিমারীর ভ্রুকুটি ডিঙিয়ে এক বিস্ময়, ঘোরলাগা বিষাদ ও উৎসারণে রঙের কারিগর, শিল্পী আব্দুস সালামের করকমলে উৎসর্গ করি।

ভাঁটফুলসূত্র চায় রোদ-বৃষ্টি, পথ ও পথিক, জীবন ও মৃত্যুর পিঠাপিঠি দুই ভাই, মায়া!

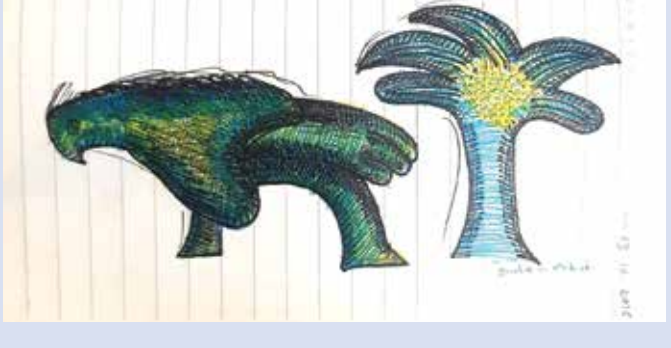

সূচি

স্মরণ: শিল্পী আব্দুস সালাম

আমান উল্লাহ
সালাম– ছবিতে লিখে গেছে সব

ইচক দুয়েন্দে
সম্রাট মালাস মুফঙ্কো

বদরুজ্জামান আলমগীর
যা না- তা করে তোলা

মোহাম্মদ কামাল
তুমি তো কেবলি ছবির সালাম

রফিক জিবরান
তাঁহার পরাবাস্তব নিখিলে

করবী দেবনাথ
শিল্পী আব্দুস সালামকে নিবেদিত চিত্রকর্ম ও লেখা

নিয়মিত বিভাগ

কবিতা

আবুল এহসান
একখণ্ড মৃত্তিকার ঘ্রাণ

সুস্মিতা চক্রবর্তী
মাছেদের গান

ইকতিজা আহসান
শিরোনামহীন

রওশন রুবী
তারপরও দেখা হয়ে গেল
ব্লুটিংপেপার

সাদাত সায়েম
প্রজাপতি জীবন
বেড়াল-মাছ

কপোতাক্ষী নূপুরমা সিঞ্চি
উলে বোনা সমুদ্র

সুরভী রায়
কদমের মলাটে মোড়া খাতা

রাশেদ কাঞ্চন
প্রয়োজনের কথাটি জোর দিয়ে বল

ভাষান্তরিত কবিতা

এমিলি ডিকিনসন
ভাষান্তর: রফিক জিবরান
পুরো সত্যটাই বলো, তবে পরোক্ষে
আমি এক সামান্য মানুষ
আমি আস্বাদ করি সেই সুরা কখনো হয়নি চোলাই
আমার চৈতন্যে জানাজার অনুভব
সাফল্যের স্বাদ

ডিউক রেডবার্ড
ভাষান্তর: শাহানা আকতার মহুয়া
আমি সেই রেডম্যান

গল্প

বেনজামিন রিয়াজী
হেডলাইট

রুখসানা কাজল
অশ্রুনদীর সুদূর পারে

অনুবাদ গল্প

কাজুও ইশিগুরো
অনুবাদ : অনন্ত মাহফুজ
অন্ধকার কেটে যাবার পর একটি গ্রাম

সান্দর জাসবেরেইনী
অনুবাদ: মাজহার জীবন
আহমদ সালেমের ঈশ্বর

প্রবন্ধ

জাভেদ হুসেন
মীনা কুমারী নায - নিঃসঙ্গ আকাশে একা চাঁদ

গ্রন্থসমালোচনা

বদরুজ্জামান আলমগীরের কাব্যগ্রন্থ– **দূরত্বের সুফিয়ানা**

শিবলী জামান
কবিতার প্রকাশিত আড়াল

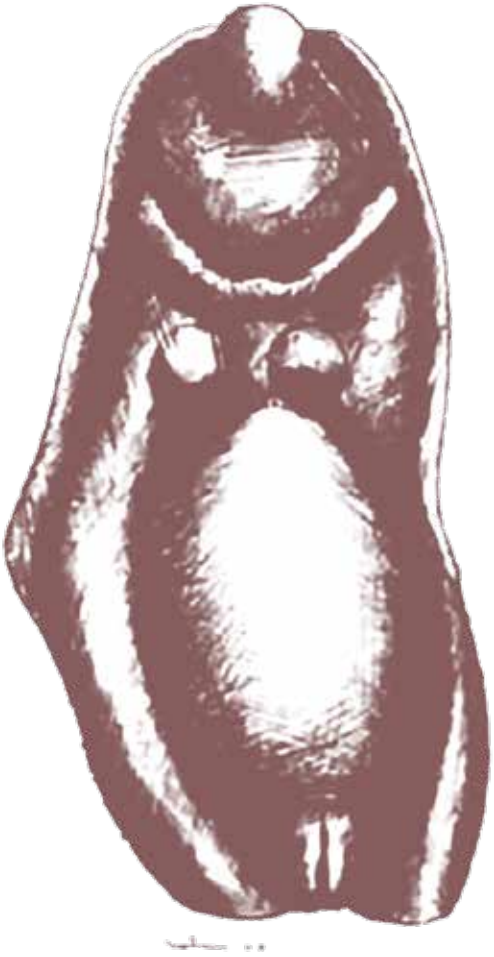

আব্দুস সালাম

ছবি আঁকিয়ে। জন্ম ১৮ মার্চ, ১৯৬৭ কিশোরগঞ্জ। পড়াশোনা করেছেন রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে- যা বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। ৩০ আগস্ট ২০২০, সাভারে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন সালাম।

এই চিত্রকল্পের যাজক রঙ ও রেখায় যে বোধির অনিঃশেষ বুনে গেছেন, তার যবনিকা হতে পারেনা।

মৃত্যু একটি উপমা মাত্র: আসা যাওয়ার পথ অঙ্কন করে, যাওয়া আসা-কে পূর্ণতার মহিমায় বাঁধে!

সালাম হয়তো আর আমাদের চোখের আগে দাঁড়িয়ে নেই, কিন্তু চোখের মণিতে আছেন- যেথা উৎসারণ, যেথা তৃষ্ণার আদি ওঙ্কার- সেখানে সালাম আছেন।

■ স্মরণ অংশের চিত্রকর্মসমূহ শিল্পী আব্দুস সালামের আঁকা

মিড সামার, এক্রিলিক অন পেপার

দ্যা গ্রেট কনজ্যাঙ্কসন, অয়েল অন ক্যানভাস

নাইট মেয়ার-১, এক্রিলিক অন পেপার

সালাম– ছবিতে লিখে গেছে সব

আমান উল্লাহ

সালামকে নিয়ে কি লিখবো। সে আমার ভাই বন্ধু। ছবিতে লিখে গেছে সব। আমরা যা লিখতে পারিনা আঁকতে পারিনা। আশি ও নব্বই দশক জুড়ে তার আঁকাআঁকির ঝড় শূন্য দশকের গোড়া পর্যন্ত থেকে থেকে জ্বলেছে কেবল।

১৯৬৭ সনের ১৮ই মার্চ কিশোরগঞ্জে জন্ম নেয়া শিল্পী আব্দুস সালাম ১৯৯১ সন নাগাদ রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে চারুকলায় প্রাক ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তারপর ঢাকায় ৩০.০৮.২০২০ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক শিল্পী হিসাবে পার্থিব জীবন কাটিয়েছেন।

সালাম ছবির বাস্তবকে নিগূঢ়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সৌন্দর্যরূপে উপস্থিত। তার আঁকা মনে থাকে। বড় সার্ফেসে ছবির কাঠামোর শক্তিকে অনায়াস রূপবন্ত করণ বা স্বাভাবিক ফর্মে ষ্টাইলে ডিস্টোর্টেড (Distorted) করে মূল আনন্দকে স্পর্শ করা। এ এক আনন্দময় ভ্রমণ। আমাদের ভয়ংকর বাস্তবের সম্মুখীন করেন। তার বোধের বিস্তারে ছবির ভাষায় অমৃতের আকাঙ্খা থাকে। কখোন শিশু, কখনো তিক্ত রিক্ত প্লাবনের আবহ। লোক, মিথের বিশেষ প্রয়োগ তার আত্মরূপ। সালামের ড্রইং সুন্দর। ছন্দময়, পাগল সৌন্দর্যরূপে তার ছবির ফর্ম চিত্রে ফুটে থাকে। ভীতি আশংকা বিভীষিকার বর্তমানকে দরদ দিয়ে আঁকেন। তার প্রত্যেকটি ছবির দেখানোয় বিনীত ভাষা অপরূপ। যা মনে থাকে।

সালামকে নিয়ে কি লিখবো, সে লিখে গেছে সব।

সম্রাট মালাস মুফঙ্কো

ইচক দুয়েন্দে

মালাস মুফঙ্কো, ছিলেন সুসানিজিফ্রোর যুবরাজ সবুতরের বাবুর্চির ভাগনে। মালাস মুফঙ্কো যুবরাজ সবুতরের জন্য প্রস্তুত উগ্র খাবার যৎকিঞ্চিত খেয়ে একটি ডিমে বন্দি হয়ে পড়েন। এ ঘটনা জেনে অনুতপ্ত যুবরাজ সবুতর সিংহাসন গ্রহণের জন্য আহুত হলে, ডিমে বন্দি মালাস মুফঙ্কোর অনুকূলে রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। ডিমস্থিত মালাস মুফঙ্কোর সিংহাসনলাভে অসন্তুষ্ট রাজপরিবারের সদস্যবর্গ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মালাস মুফঙ্কোকে ধারণকারী ডিমটিকে সজোরে আকাশে নিক্ষেপ করলে সেটি বাংলাদেশে পতিত হয়, তথায় তিনি ডিম থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে আবদুস সালাম নামে চিত্রকরের পেশা ধারণ করেন। সেথায় ব্যাপক জননন্দিত হবার পর সম্প্রতি তিনি সুসানজিফ্রোতে প্রত্যাবর্তন করেছেন বলে পৌরানিক মহলে জোর রব উঠেছে।

ফলবতি ধরা, কাগজে এক্রিলিক রং

পাখি, কলম স্কেচ

যা না- তা করে তোলা

বদরুজ্জামান আলমগীর

ঢাকা প্যারিস না, নিউইয়র্ক না, কলকাতা, টোকিও, বা সাও পাউলো, ফ্লোরেন্স নয়। ঢাকা এক অচিন নগর, বাতেনী গ্রাম। বাস্তবিক যা ঢাকা- তার থেকে বেশি আকর্ষণীয় অধিবাস্তবের ঢাকা- যেখানে লাল লাল নীল নীল বাত্তি দেইখা আশা ফুরাইসে!

ঢাকা বড় ভিড় বাট্টার নগর- ফলে তা ভীষণ নিঃসঙ্গতায় কাতরায়; ঢাকা ঐন্দ্রজালিকভাবে স্বপ্নময়- তাই এখানে বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ ওঠে ওই; নিঝুম বৃষ্টির তীক্ষ্ণ বলমে স্টার ওয়ার্স- মেঘের ফোঁটা গলেগলে পায়ের তলায় বিছানো কাঁকর।

ঢাকা মায়াবী কামরুল হাসান, এখানে ২দিন থেকেই নড়াইল চলে যান এস এম সুলতান, পুরান ঢাকার ঠাসাঠাসিতে কিছুটা হাঁপিয়ে ওঠে নারায়ণগঞ্জের দিকে সোনারগাঁও পানাম সিটিতে কাদায় আটকে যাওয়া গরুর গাড়ির চাকা টেনে তুলতে লুটাপুটি খান জয়নুল আবেদিন।

আবার এ-শহরেই আছেন এমন বিবিক্ত হ্যাঙওভার পটুয়া- যারা সবার চোখের সামনে আড়ালে আবডালে ঢাকার প্যারিসে থাকে, তারা থাকে নিউইয়র্কের চেলসি ছবির হাটে- তাদের ঢাকা ভুবনপুর কলোনি, উড়ন্ত সসার, তারা ২৪ঘন্টা শাহবাগ মোড়, ধানমণ্ডি ভুতের গলির ব্রিজের উপর বসে চা খায়, চানখাঁর পুল রেইনট্রি গাছের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে।

তারা পাক পাঞ্জাতন- অবহেলায় দারিদ্রে দিব্যজ্ঞানে মৃত্যুর আগাম খবর জানে, কিন্তু ঢাকা কারবালার মাঠে এতোটা নিষ্ঠার সাথে জীবন-মরণের ডুবসাঁতারে ঝাঁকিয়ে ওড়ে, দেখলে মনে হবে- তারা গভীর খাদ কী পাহাড় চূড়াকে থোড়াই পরোয়া করে- তাদের রোখে, অভিজ্ঞানে হারজিৎ বাজিকরের হাতের ভেলকি ছাড়া আরকিছু তো নয়।

ব্যাপক সংখ্যালঘু নগরবাসী পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে- অগণিত ভাসমান মানুষের আহাজারি তাদের সুখনিদ্রাকে আরো লোভনীয়, কাম্য ও মর্যাদাবান করে তোলে; এই যে রাতজাগা নির্ঘুম ট্রাকের জিঘাংসা ও ক্ষুধা- তাকে ফয়সালা করার নির্বানে মৃত্যু গহবরে অবলীলায় মুখ বাড়িয়ে রাখে ঢাকার পেইন্টার আব্দুস সালাম- আমাদের ক্যারাভাজিও- কোন দিকভ্রান্তিতে সকালের দুধ রোদে নিশিপাওয়ার এমন ঘোরে চুবিয়ে অষ্টগ্রামের পনির হয়ে তিনপথের মোড়ে মৌমৌ করে! কিশোরগঞ্জ খড়মপট্টির সুবাসে বেহুঁশ দীপ্র সহিস কী তখন ছুটে যাচ্ছিল রাজশাই পদ্মাপাড়ের কাঁটালতা বাবলা গাছের ছায়াহীনতার দিকে?

কিশোরগঞ্জের, কী রাজশাহীর, না হয় ঢাকার সালাম ইজেলে মোকাবেলা করে তমসার দ্রাঘিমা, তার তুলিতে বিছানায় অজন্তা ইলোরার আদিম নারীপুরুষ বুঝি ইসলামপুরের বদ্ধ ঘরে কেঁচো হয়ে কিলবিল করে, কোথাও বা আচমকা মিথের নৃশংস সুন্দর প্রতিভাসে ফোটে; এভাবেই আব্দুস সালাম- কিশোরগঞ্জের ভ্যান গঁগ- মৃত্যুর পরাগ, আলতা ও ব্রাশের স্ট্রোকে চেনা, লণ্ডভণ্ড ভাসমান ক্ষরণশীল ঢাকাকে করে তোলে পিকাসোর বারসিলোনা, দ্য ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলোর রোম, এন্ডি ওয়ারহোলের পিটসবার্গ।

থ্রি ব্লাইন্ড ফ্রেন্ড,

আব্দুস সালাম, ওয়েল অন ক্যানভাস

তুমি তো কেবলি ছবির সালাম

মোহাম্মদ কামাল

দীর্ঘদেহ পুত্র কায়া; ছায়া মধ্যগগনের সূর্যে
ছোট হতে হতে বিনয়ের বিন্দু;
শামুকের একবিন্দু চোখে চোখ রেখে
আলো কথা বলে, আঁকা নিরন্তর,
তারা তারা আবর্তন আকাশের।

হাঁটতোনা ও চলতো যেন
তুলিকার পায়ে পায়ে ছোঁয়া
চলতি জীবন ছবি,
কণ্ঠ এত স্বপ্নমায়া ঝরা হয় কারো,
চোখে ভেসে ওঠে কুয়াশায় সূর্যদিন,
মেঘ মাখা রক্তিম অন্তিম,
রাতের তারারা তার চোখে, যত অন্ধকার, সোনা আলো চিকচিক!

যাকে করবে শিকার
তাকে সিংহেরবৃত্ত পথে ঘুরে ঘুরে

দেখা শিল্পের মানব,
চোখে চোখ রেখে মাপা
আঁকা স্বপ্ন মাত্রা; দুঃস্বপ্ন জারিত
অধিনায়কের উজ্জ্বলতা।

নিশি পেয়ে জেগে প্রকৃতির ডাকা পথে ঘোর লাগা
হারানো হরিণ দৃষ্টি, সারারাত ক্যানভাসে

নারী-১, কলম স্কেচ

অন্ধকার মুছে মুছে ভ্রম ভোর,
বাংলার বিবিধ পাখির নাগরিক আরণ্যক সাড়া,
পৃথিবীটা ঘিরে ঘুরে ঘুরে হাওয়ার মহাবলয়, মেঘের ওড়া; বৃষ্টি! হাওয়া বিশুদ্ধকরণ নিহর কণা
কত কত ঝরা শিউলির মুখ ভরে,
তুমি তার পেলবতা ছুঁতে গিয়ে,
ভোরের বাতাসে ঘোলের মাখনগন্ধ;
সাগর ছলাৎ নোনা, বুক ভরে যায় আনমন,
ঝটিকায় ভোরের জীবনানন্দ ট্রামের দুর্ঘট,
থ্যাতা মানবের মাটির ঘরের ফেরা; শেষ বিদায়ের স্মৃতি
কে কাঁদে জগতে কলিরা কাঁদুক,
তুমি তাও মৃত্যুর ওপারে মৃত্যুদূতের চোখেও চোখ রেখে,
স্মিত হাসি মুখ, বুড়ি ছায়া মোছা মাজা কাঁসা থালা, প্রাকৃতিক চাঁদের বিদ্যুৎ!

দুটি নয়ন তুমি-তো রেখে গেলে আপন সন্ততি,
অবিরাম ছবি পাঠানো স্বর্গেও
এই পৃথিবীর দুটি শিল্পী পরম্পরা চোখ!

নারী-২, কলম স্কেচ

তিমির স্বপ্ন, কাগজে এক্রিলিক রং

তাঁহার পরাবাস্তব নিখিলে

রফিক জিবরান

১.
তথায় আঁকেন তিনি আগুন ও আত্মা –
চিত্র হয় কালের চৈতন্যচরিত।

২.
ঘোড়াউত্রা– নরসুন্দার আকুলিবিকুলি– পদ্মার তীর
বোধের রেখা পার হয়ে কল্পনার শরীর–
সুন্দরবন– বেঙ্গল টাইগার– মহাকাল গড়–
ফ্রেমবন্দী করেন তিনি প্রেমবন্ধে মানুষ ও প্রকৃতি।

৩.
ইচক দুয়েন্দে, অসীম কুমার ভাবের সহোদর–
অলৌকিক প্রেমের শহর– তাঁহার পরাবাস্তব নিখিলে–
বোর্হেসের পাঠকক্ষে তিন অন্ধকবি
রঙতুলির রেখায় ধ্যানমগ্ন– স্থির।
৪.
বাজুক শত তোপধ্বনি –
সুসানজিফ্রোর সম্রাট– মহামহিম মালাস মুফঙ্কো– আব্দুস সালাম!

বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা

করবী দেবনাথ

এ ছবিটি আমার ক্লাশমেট ও বন্ধু সালামের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে আঁকা। রাজশাহী আর্ট কলেজে আমার চারুকলা জীবনের শুরু। সালাম সেখানেই আমার সতীর্থ ছিল। সালাম স্নেহভরে আমাকে 'বোন' বলে ডাকত। সে চোখেই আমাকে দেখত ও।

সালাম,

তোমার এই পৃথিবী থেকে অকালে চলে যাওয়া আমার ব্যক্তিগত স্মৃতির মণিকোঠায় এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। মনে পড়ছে কত কথা। ভেসে উঠছে পল্লী-বাঙলার বুকে আমাদের দল বেঁধে ছবি আঁকতে যাওয়ার সেইসব দিন। কত যে ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছিলাম আমরা সবাই। আমার সব চিন্তা আর প্রার্থনা এ মুহূর্তে তোমাকে ঘিরেই। তোমার আত্মা চিরশান্তি পাক।

মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর: কল্যাণী রমা

কবিতা

আবুল এহসান

একখণ্ড মৃত্তিকার ঘ্রাণ

আকাশেরও অধিক নীল বর্ষণ ছিল আজ সারাদিন।
শিশিরের মন্দিরায় এখনো ঝরছে ক'ফোঁটা টুপটাপ।
বুনো ঘাসের শরীর ছুঁয়ে যে জলদ ঘ্রাণ
ভরিয়ে দেয় আমায়, বলে ভালবসি, বড় বেশি ভালবাসি
এই অন্ধকারে তোমার শেষ চুমুকে,
সে যেন ধুয়েমুছে আরও গাঢ় করে গেছে
এ বিদায়ের বিষণ্ন লগন।

কেননা, কালই আমার প্রতীক্ষার দিনলিপি
চাপা পড়ে যাবে মানুষের শোকভারে।
আমার বুকে ঘুমিয়ে পড়া দ্রোহী স্মরণে
তৈরি হবে একটি মনুমেন্ট।
আর এক নিকষ কালো সামিয়ানায়
ঢেকে যাবে আমার পৃথিবী,
জানবে না কেউ
শোকের আড়ালে নিরবে কেঁদে যাবে আরো এক স্তব্ধ শোক!

আমার দেখা হবে না আকাশ,
তারাঞ্চিত রাত্রির সঘন অভিসার,
দেখা হবে না চোরা কাঁটায় গেঁথে যাওয়া
শতযুগলের নানা রঙের গল্পগুলি।

ফোটানো হবে না আর কোনোদিনই
এমন কি ছোট্ট একটি ঘাসফুল।

অথচ কি দীর্ণ কেটে যায় প্রতিটি ঋতুর প্রহর আমার!
আমি অপেক্ষায় থাকি
চৌচির ঠোঁটে এতটুকু জলের তৃষ্ণায়।
অপেক্ষায় থাকি
বৃষ্টিক্লান্ত দিনের শেষে শীতের মৌনতায়।
অপেক্ষায় থাকি
চৈত্রের নিষ্পত্র হাহাকারে
পুষ্পভারানত শাখার সম্পন্নতায়।

ও আকাশ, দূরের সখা
মানুষের জন্যে কেন রাখলে না তোমার
নিরাভরণ জীবন!
কেন সাজাতে গিয়ে
নিজেকেই সে করে হরণ বারবার!
বিদায়, সমুদ্র থেকে মেঘমালার পোশাক পরে আসা
হে আমার নাবিক প্রেমিক, বিদায়!

দুঃখ করো না।
আমার ক্রন্দসী আত্মার উপর শোকার্ত মানুষের
যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পিত হবে ফিবছর,
তাকে জেনো আমারই শুভেচ্ছা তোমার জন্যে।
বিদায় বন্ধু বিদায়!

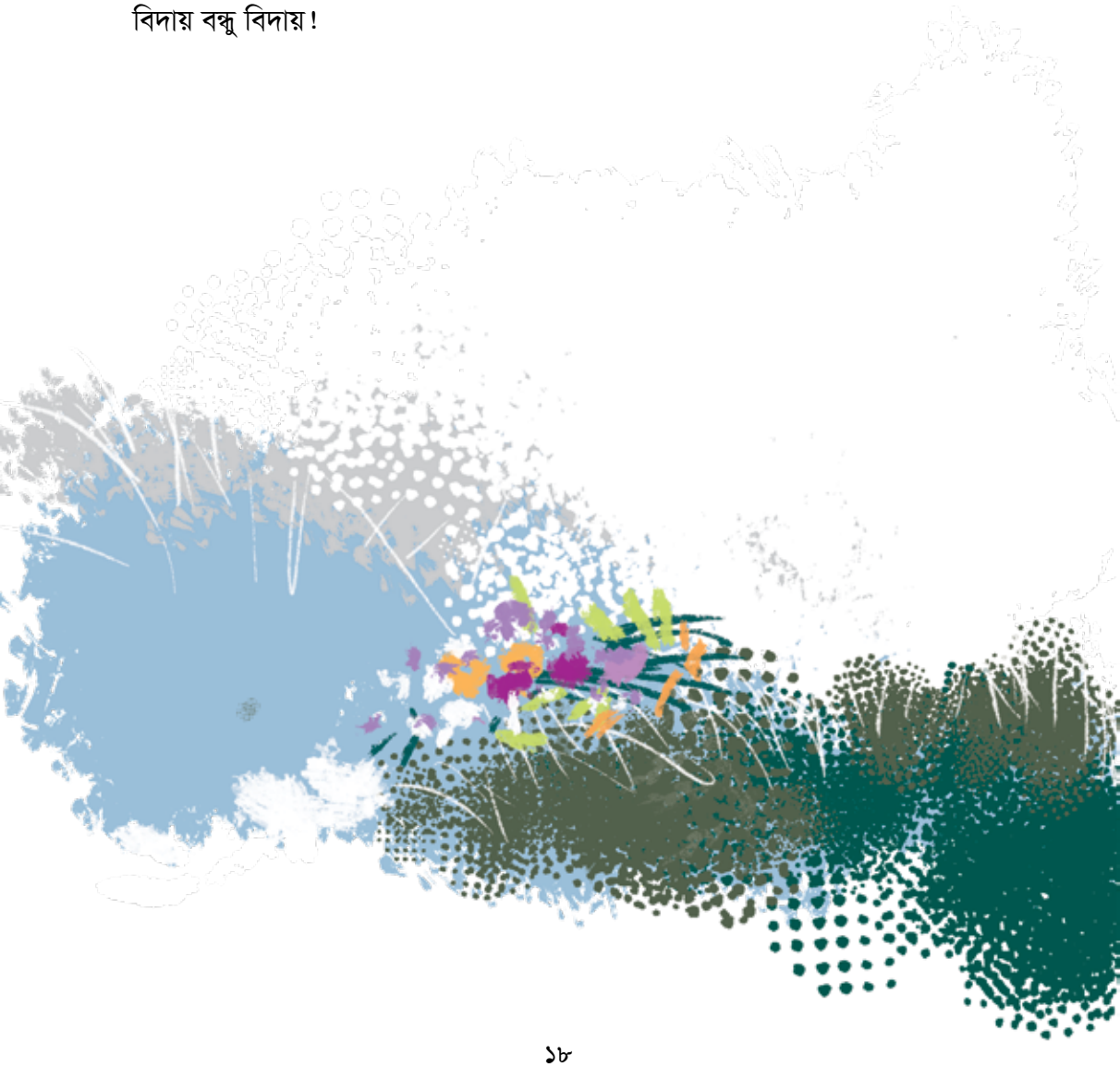

সুস্মিতা চক্রবর্তী

মাছেদের গান

বাবারবার আমি পাকিয়ে তুলি ঐ মধু আর মোম
বার বার আলো জ্বালি
বার বার জল দিই গাছের শরীরে
কান পেতে শুনি তার নতুন দিনের গল্প,
শোনাই পাথরে ফুল ফোটানোর
আয়োজন-আলোড়ন,
পাখির গান, গাছের গান,
এমনকি জলাশয়ে মাছেদের গান!
একটা ফুটে ওঠা ফুলের
সুঘ্রাণের জন্য
কল্পনার নাক নিয়ে
ঘুমিয়ে পড়ি আমরা
হাত ধরাধরি করে,
অথচ আমাদের মায়াবী সে দু'হাত
একটা মোহের কাছে,
একটা স্বেচ্ছাচারী ভুলের কাছে,
ছিন্নভিন্ন হয় বার বার,
অখণ্ড-অদ্বৈত হয়!
অথচ বিপন্ন ঐ বাতাসে
বিভ্রান্তির চারাগাছে,
আমার আরও কিছু দরকারী মুহূর্ত সময়,
আরও কিছু অকারণ আনন্দ,
সুগন্ধী মশলার তুমুল চাষবাস,
সত্য ইতিহাসের পুরাণ-পাঠ,

ডাইনীর হত্যাযজ্ঞ,
তার চেতনার গভীর শেকড়ে
বুনে দিতে পারতেই হতো!
আমার পরমহংসের পাখায়
ঘিরে দিতে হতো ঠিক,
মায়াকাজলের কোনো দ্যুতিময় দূর্গ!
যাতে বিভ্রান্ত বেদনা-দিন শেষে,
সত্যের সুরক্ষিত সূর্যের ঐ সড়কে
মেয়ে তুমি,
পৃথিবীতে হেঁটে যাও,
মাথা উঁচু করে!
আরও আরও সীমাহীন সহস্র সময়!

ইকতিজা আহসান

শিরোনামহীন

হে বিভ্রান্ত সময়ের শতকিয়া, এই সকালটা যদি সত্যি না হয়
তুমি আমি মিথ্যে হয়ে যাব!
মিথ্যে হয়ে যাবে আমাদের সমুদয় ঘাম
তোমার ভেতরে যে পাহাড় আর নদী আছে
যাকে আমি উড়িয়েছি পলকা পালকের ন্যায়
আর যে স্রোত উড়িয়েছি তোমার বক্র আঁচলে
তার সম্পাদ্য চিরদিন নিষ্পত্তিহীন থেকে যাবে!

খুব গভীর মিথ্যা হয়ে আমরা মিলিত হয়েছিলাম
আমরা সময়ের শতকিয়ার ভেতরে জট পাকিয়েছিলাম
অসুখের ঘরের নামতা পড়তে পড়তে
এক মহাজাগতিক গুণীতকে আমি তোমাকে পেয়েছি
তুমি আমাকে দৈবচয়নে এক দীর্ঘ ঘুমের মতো যাপন
করেছিলে!!

এক বিভ্রমের জাদুকর আমাদের জড়িয়ে ছিল মিথ্যার মতো
আমাদের ত্বক পরস্পরে জেগে উঠেছিল মিথ্যার অবতলে
মিথ্যা সময়ের গল্পে চরিত্ররা বাংময় আমাদেররক্তে
আর রক্তের ভেতর মিশে গেছি আমরা বিমূর্ত সময়!!

রওশন রুবী

তারপরও দেখা হয়ে গেল

তোর আর আমার দেখা হবে না জেনেই উল্টে গেল ঋতু
বদলে গেছে সবুজ, নদীগুলো বিষধর সাপের অবিকল,
না তুই, না আমি অসতর্ক ছিলাম; ডাকিনি কেউ,
আমাদের মাঝে বিনানোটিশে ঢুকে পড়েছে সে।

আমি আর তুই আমাদের নাম লিখতে লিখতে যেদিন
মার্বেল হয়ে গিয়ে ছিলাম, সে-ই সেদিন শপথ ছিল
ছুটি নেই, তবু আজ ঘন্টা বাজে সাদা সাদা জোছনার;
আমাদের দেখা হবে না জেনেই যত্রতত্র লকডাউন।

তারপরও অজস্র চোখ ফাঁকি দিয়ে দেখা হয়ে গেল
অতন্দ্রবোধের অণুতে তখনো ফুটেছিল বকুল।

রওশন রুবী

ব্লুটিংপেপার

বন্ধু মানে ব্লুটিংপেপার
শুশ্রূষাহীন ক্ষত
সুগন্ধী পৃষ্ঠা জুড়ে
শিল্পের আগুন যত।

সাদাত সায়েম

প্রজাপতি জীবন

হঠাৎ–
আমার দুচোখ থেকে লাফিয়ে নামল
হলুদ ফড়িং, লাল নীল প্রজাপতি
বেগুনী ফুল, ছাই-রঙা বাছুর, উচ্ছল বুলবুল

কিন্তু দেখি–
দাঁড়িয়ে আছি শহরের রাস্তার ধারে আনমনে
জলোহাওয়া হঠাৎ মুখে
মা'র শাড়ির ভেজা আঁচলের মতো
পরশ বুলিয়ে গেল মিলিয়ে
কোথায়! এই মারিগ্রস্ত শহরে, দ্রুতগামী গাড়ির পিছু পিছু!

বর্ষাতির উপর ঝরে পড়ছে টুপটাপ আষাঢ়
প্রেয়সীর চুলের ডগা থেকে যেমন ঝরে পড়ত
বৃষ্টির ফোঁটা– কান্নার মতো
গাড়ির হর্ন, ধাবমান এম্বুলেন্সের সাইরেন ছাপিয়ে
শোনা যাচ্ছে শুধুই নদীর কুলকুল
তবে কি আমি ফিরে পাচ্ছি আমার
হারিয়ে যাওয়া প্রজাপতি জীবন!

কিন্তু দেখি–
শহরের প্রধান সড়কে ঘূর্ণিস্রোত
তাতে ডুবে আর ভাসে এক মৃত বুলবুল

সাদাত সায়েম

বেড়াল-মাছ

স্বপ্নে দেখি আমি–

একটা গহীন পাতকুয়া

নতুন পানিতে টইটই হয়ে আছে

তরুণ এক শিল্পী দেখাচ্ছে তার সাম্প্রতিক সৃষ্টি

বেড়ালের-আদলে-গড়া পাথরের মাছ কুয়ার জলে ভাসে

কপোতাক্ষী নূপুরমা সিঞ্চি

উলে বোনা সমুদ্র

মৎস্যাধারের নিরুদ্যম জলে পুষে ছটফটে সোনা মাছ
অলীক সমুদ্রের সাজে শ্যাওলা জমাটে চলনে হাসফাস,

দম আটকে গোত্তা মারে যেন পাগলা ষাঁড়ের সোসর
কাচ ভেঙ্গে কপাল কাঁটে রক্তে ভাসে সোনার গতর।

রক্ত তিলকে প্রমোদালয় ছেড়ে মীন ভিরলো পুটির দলে
রক্তিম শ্যাওলা ঝেড়ে ফের কুসুমিত সোনা রং টলমলে,

পুটির সাচ্ছন্দ্যে কাদায় লুটোপুটি ঘুমায় কাদা জলে
সন্ধ্যের হিরক তারা বাসা বেঁধেছে অঙ্গে সহস্র কালে।

বণিকের কোঁচ আঁশে বিধে গড়ে কৃত্রিম মুক্তা লালসার
স্রোতে ভেসে সমুদ্রে যায় নিশ্বাসে ওঠানামা ফুলকার।

পাথরে জলে ফেলে আসে শেষ আখ্যান আদি মাটির
যত গহিনে তলায় কেবল রক্তের ছাপ লাশের বুকে তীর,

নুড়ি পাথরে নকশার খোদাই যেন লেজ মেলে বসা পাতিহাস
সৎকারহীন লাশের ইমারত কয় হাজার বছরের ইতিহাস,

সমুদ্রের অতলে শ্বাস আটকে মুক্তির আয়াত আনে যে মাছ
ঠাকুমা আংগুলে সূচ ফুটিয়ে রক্তের উলে বুনে তার আঁশ।

সুরভী রায়

কদমের মলাটে মোড়া খাতা

আষাঢ়ে বৃষ্টির ছাঁট ছোঁয়া কদম
রাখা ছিলো খাতার মলাটে!
সে খাতাটা চুরি হয়ে গেছে!

সারাদিন গুড়ুগুড়ু সুর করে মন খারাপ মেঘ,
ভেসে চলে গেছে কোথাও দূরে!
আষাঢ়ের পয়মন্ত এমন দিনেও,
রোদ ভরা আকাশে তাই মেঘ ভীড় করে না!

যে সাদা ঘুড়িটা সবুজ মাঠের পুবে উড়তো,
মেঘের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে, আজ ক'দিন হয় সে নিখোঁজ!
সাদা মেঘেদের ভীড়ে,
সাদা ঘুড়িটা কে পাওয়া যাচ্ছে না!

কদম ফুলের মলাটে মোড়া খাতায়
তোমায় নিয়ে লেখা,
আমার একটা লাইন খুঁজছি,
ভীষণ অক্লান্ত হয়ে খুঁজছি!

স্বপ্ন ভাঙা ঘুমের এক ভোরে,
সে লাইনটা খুঁজে পেলাম!
কোনও এক পুকুরের জলে!

জলে, ধূসর রাজহাঁসের সাথে
দুলে দুলে ভাসছে কদম ফুলের মলাটে মোড়া
চুরি হয়ে যাওয়া
আমার খাতার পাতা!

হয়তবা,
সেই ভোরে কদম ফোটে কোথাও!
কোথাও বৃষ্টি হয়, মেঘের সাথে সন্ধি করে!
দোকানে গিয়ে কদম ফুলে মোড়া
একটা লেখার খাতা কিনে আনতে পারি না!

আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভিজে যায়, সব!

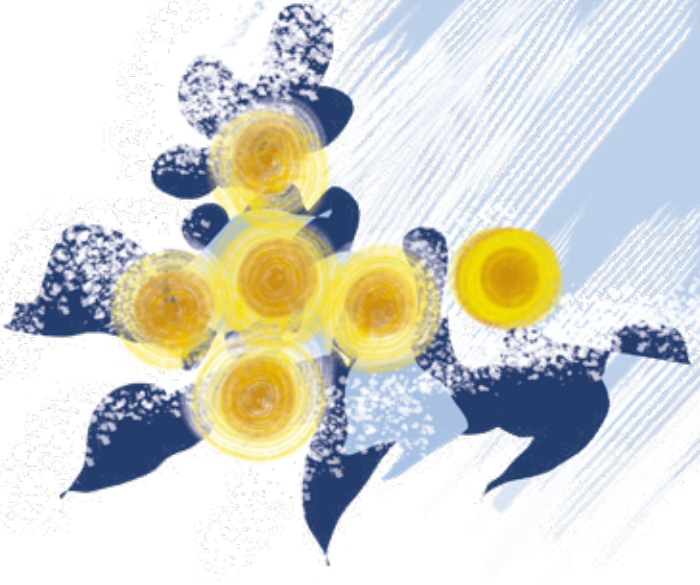

রাশেদ কাঞ্চন

প্রয়োজনের কথাটি জোর দিয়ে বল

মুখটা বন্ধ রেখো না আর কথা বল
কথা বলো এমন যেন কথার ভেতর
কথারা আটকে না থাকে,
যেন কথারা হয়ে না ওঠে কথার কথা;
যত কথা আছে মনের ভেতর বলে ফেলো;
অমৃত হোক কিম্বা গরলই হোক
প্রয়োজনের কথাটি জোর দিয়ে বল
জোকের মুখে লবনজলের কথাটি বলে দাও।

ম্যাজিসিয়ানের কারসাজি যদি বুঝে থাক
তবে বলে ওঠো কী চাতুরি তার আস্তিনে!
ভণ্ডের ভণ্ডামি যদি বুঝে থাক
তবে বলে ওঠো কী লুকনো তার মনভাণ্ডে!
পীড়কের পীড়ন যদি বুঝে থাক
তবে বলে ওঠো কীসে তুমি হয়েছ পীড়িত!

নির্বোধের বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ,
বোকার ভ্যাবলা চাহনি
ভীরুর ভয়ার্ত দৃষ্টি
ওদেরকে উৎসাহিত করে। তাই ওরা
প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রক্তচক্ষু দেখায়।

মুখটা বন্ধ রেখো না আর কথা বল
কথা বলো এমন যেন কথার ভেতর
কথারা আটকে না থাকে,
যেন কথারা হয়ে না ওঠে কথার কথা;

যত কথা আছে মনের ভেতর বলে ফেলো;
অমৃত না হোক গরলই হোক
প্রয়োজনের কথাটি জোর দিয়ে বল
জোকের মুখে লবনজলের কথাটি বলে দাও।

পাঁজরের তলে ঝাঁপি খুলে দেখ
বুকের অতলে কী ঐশ্বর্য কোন ইতিহাস ডুবে আছে!

দ্যা গ্রেট কনজ্যাঙ্কসন, অয়েল অন ক্যানভাস, আব্দুস সালাম

এমিলি ডিকিনসন

ভাষান্তর: রফিক জিবরান

পুরো সত্যটাই বলো, তবে পরোক্ষে

(Tell all the truth but tell it slant)

পুরো সত্যটাই বলো, তবে পরোক্ষে
অল্প অল্প করে ঘুরিয়ে
তীব্র আলো সহ্য করে না চোখ
হঠাৎ ঝলকে থমকেও যেতে পারে।

শিশুরাও সয়ে যায় বিদ্যুৎ চমক,
তেমন করে বুঝিয়ে বলার পরে,
সত্যের ঝলক ধীরে হলেই ভাল
নতুবা মানুষ অন্ধও হয়ে যেতে পারে–

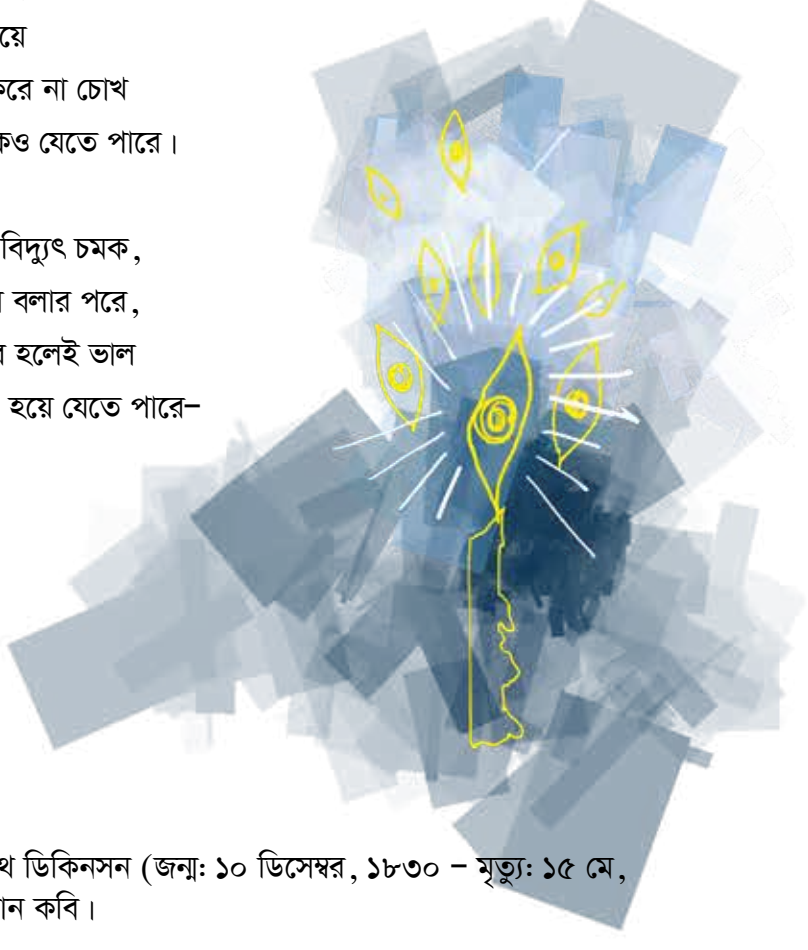

*এমিলি এলিজাবেথ ডিকিনসন (জন্ম: ১০ ডিসেম্বর, ১৮৩০ – মৃত্যু: ১৫ মে, ১৮৮৬) আমেরিকান কবি।

এমিলি ডিকিনসন
ভাষান্তরঃ রফিক জিবরান

আমি এক সামান্য মানুষ

(I'm Nobody! Who are you?)

আমি এক সামান্য মানুষ! তুমি?
তুমিও কী আমার মতই সামান্য?
বাহ! আমরা তাহলে একই মনের
কাউকে বোলোনা বাইরে– প্রচার করে দিবে।

কী ফাঁপা– এই কেউকেটা বনে যাওয়া!
সকলের সামনে– ব্যাঙেরা যেমন
নিজেদের নাম জপে– ঘ্যানর ঘ্যানর
মোসাহেবদের ভীড়ে।

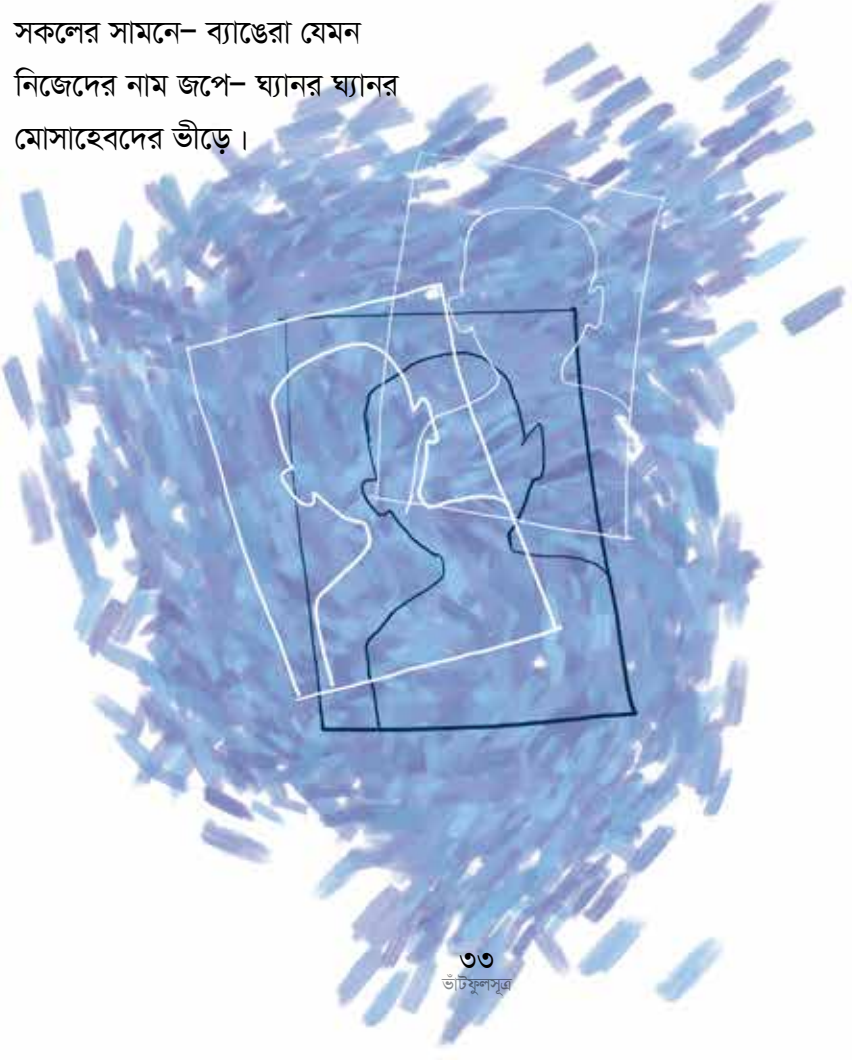

এমিলি ডিকিনসন
ভাষান্তরঃ রফিক জিবরান

আমি আস্বাদ করি সেই সুরা কখনো হয়নি চোলাই

(I taste a liquor never brewed)

আমি আস্বাদ করি সেই সুরা কখনো হয়নি চোলাই–
মুক্তায় মোড়ানো শাহী পানপাত্র দিয়ে–
রাইন উপত্যকার কোন ভাটি থেকেই
তৈরি হয়না যে সুস্বাদু মদিরা!

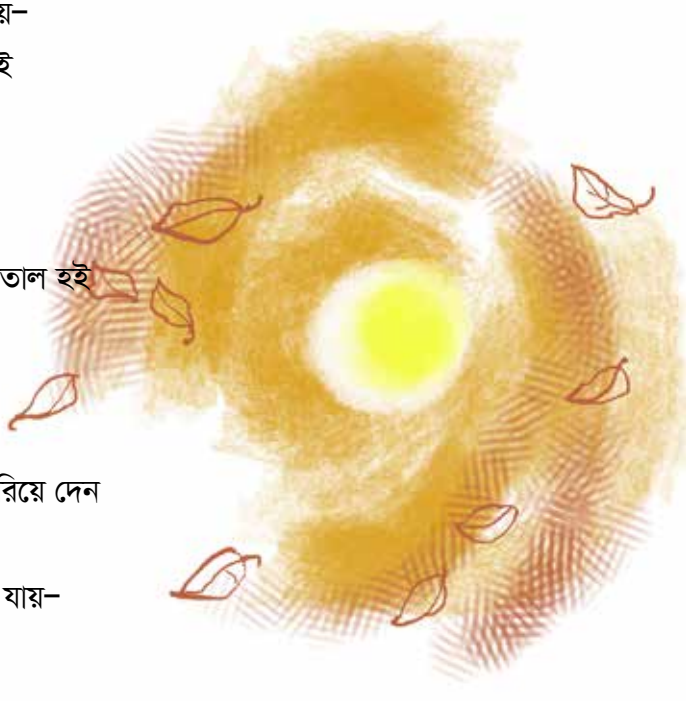

বাতাসের মাদকতা–
এবং শিশিরের উন্মত্ততায়– আমি মাতাল হই
গ্রীষ্মের অন্তহীন দিনে–
সরাইখানার ঝরে পড়া নীল ফেনায়

প্রভুও যখন মাতাল মৌমাছিদের ফিরিয়ে দেন
নিকুঞ্জের দরজা থেকে– আর
প্রজাপতিরা শোকর জানাতেও ভুলে যায়–
আমি তখন আরও মাতাল হই

যতক্ষণ না ফেরেস্তারা তাঁদের তুষার-টুপি দোলায় আর
সন্তরা দৌড়ে আসে জানালার কাছে–
দেখার জন্য যে– এক সামান্য মাতাল
সূর্য হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে–

এমিলি ডিকিনসন
ভাষান্তরঃ রফিক জিবরান

আমার চৈতন্যে জানাজার অনুভব

(I felt a funeral in my brain)

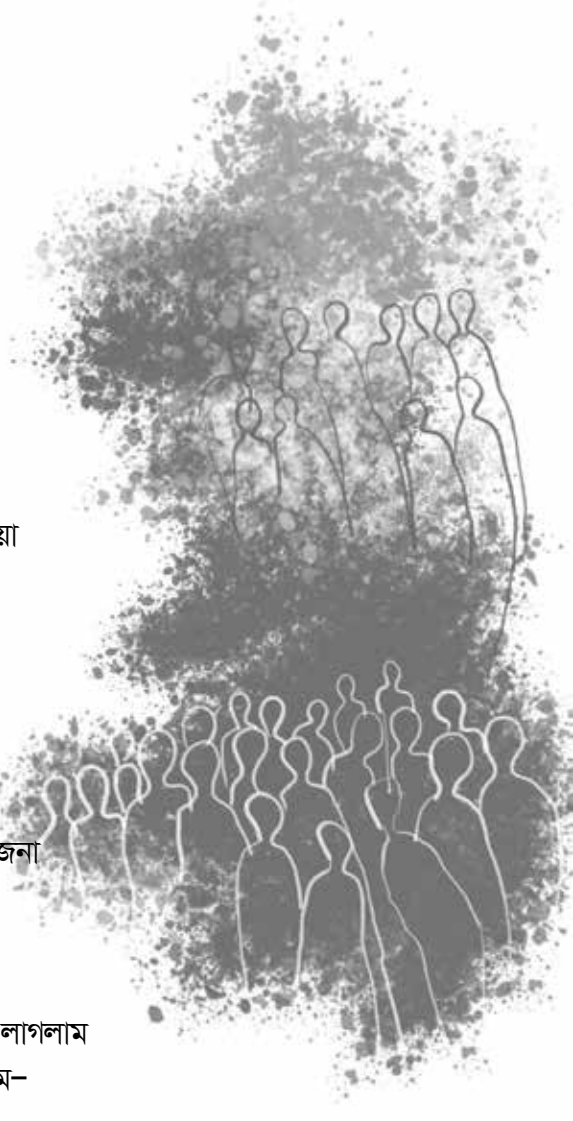

আমার চৈতন্যে জানাজার অনুভব–
শোকাহত মানুষের দল যাচ্ছে আর আসছে
চলছেই– আসা যাওয়ার মিছিল যতক্ষণ না
চূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে দৃশ্যটি–

সবাই যখন বসল নিজ আসনে আর
হাজির হল ঢোলবাদ্যের সেবকেরা
বাজাতে থাকল বাদ্য বিরামহীন– মনে হল
আমার অনুভূতিগুলো অসাড় হয়ে যাচ্ছে–

শুনতে পেলাম ওরা উপরে তুলছে একটি খাটিয়া
আমার আত্মা যেন বিদ্রুপ করে উঠল–
সেই মানুষদের পদশব্দ শুরু হল আবার
এরপর সব ফাঁকা–

সকল বেহেশতে বেজে চলেছে একই বাজনা
এবং চির অস্তিত্ব– সেই তারই কুহরে
আমি আর নিরবতা– যেন আনকা মুখোমুখি দুজনা
এখানে এই বিধ্বস্ত, নির্জনে–

আমার বোধের শেষ বাঁধনটিও ভেঙে পড়ল–
আমি কেবল নিচে আরও নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম
আর পৃথিবীর সব কোণায় ভেসে যেতে থাকলাম–
তারপর সমাপ্তি আর এই জানা–

এমিলি ডিকিনসন
ভাষান্তরঃ রফিক জিবরান

সাফল্যের স্বাদ

(Success is counted sweetest)

সাফল্যের স্বাদ মধুরতম জানে তারাই
কখনো পায়নি যারা স্বাদ সাফল্যের।
অমৃত সুধা উপভোগ করে সে-ই
সবচেয়ে বেশি তৃষ্ণা যার।

বিজেতা বাহিনীর দল–
যারা আজ জয়ের কেতন উড়ায়–
তারা কেউই জানে না বিজয়
কাকে বলে, পারবে না দিতে স্বচ্ছ ধারণাও

পরাজিত সেই সৈনিক– মৃত্যু পতিত
নিষিদ্ধ কর্ণকুহরে, তখন
বেজে ওঠে সূদুরে বিজয়ের রাগিণী
মর্ম যন্ত্রণায়, পরিষ্কার।

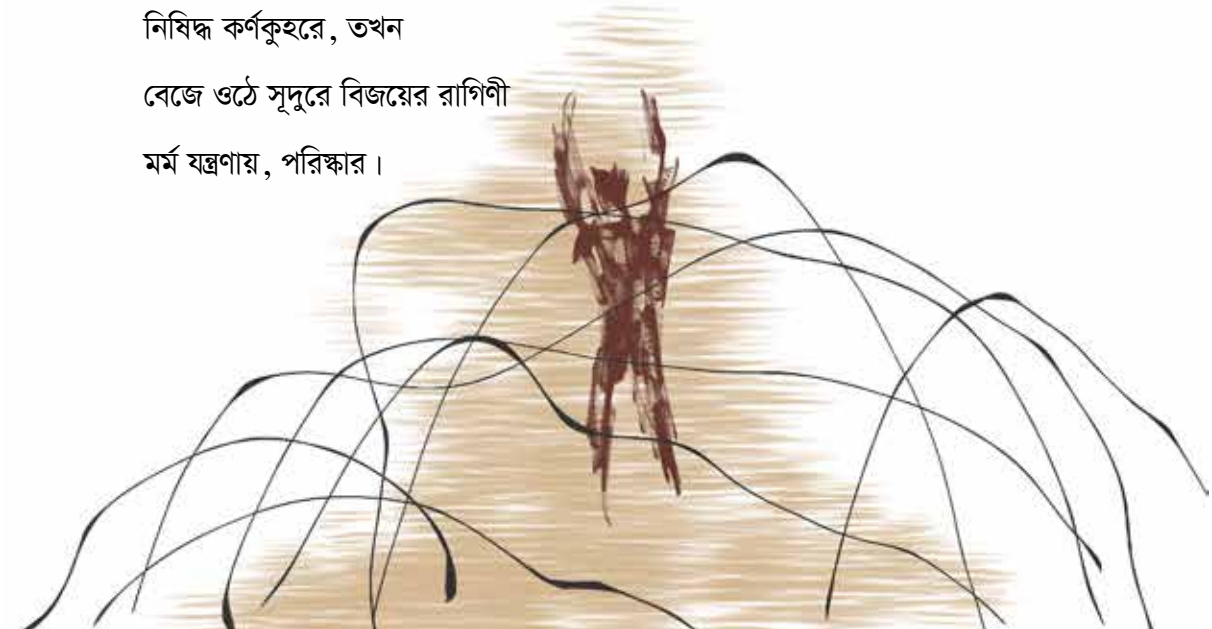

ডিউক রেডবার্ড

ভাষান্তরঃ শাহানা আকতার মহুয়া

আমি সেই রেডম্যান

আমি সেই রেডম্যান
বন, পাহাড় আর হ্রদের সন্তান
অ্যাসফল্ট দিয়ে কি হবে বলো?
ইট আর কংক্রীট দিয়ে কী-ইবা বানাবো!
তোমাদের যান্ত্রিক বাহন আমি কিভাবে ব্যবহার করব?
তোমরা ভাবতে পারো যে যে এইসব উপহার স্বর্গ থেকে পেয়েছো
কিন্তু সেজন্য কি আমাকেও বিনয়ে গলে যেতে হবে তোমাদের কাছে?

আমি একজন রেডম্যান,
বৃক্ষ, উপত্যকা আর স্রোতস্বিনী নদীর সন্তান।
ওসব চিনেমাটি আর স্ফটিকমালা দিয়ে কি হবে, বলো?
কি হবে হীরে আর স্বর্ণপিণ্ড দিয়ে?
বেশুমার অর্থবিত্ত দিয়ে কী-ইবা করা যায়?
তোমাদের কাছে এসব স্বর্গীয় উপহার মনে হতে পারে
তাই বলে আমাকেও কী ব্যগ্র হয়ে সেসব গ্রহণ করতে হবে?

আমি একজন রেডম্যান,
পৃথিবী, জলস্থলী আর আকাশের সন্তান।
সিল্ক বা ভেলভেট কিভাবে ব্যবহার করতে হবে?
কেনই বা আমি নাইলন আর প্লাষ্টিক ব্যবহার করব?
তোমাদের কাছে সেসব দারুণ পবিত্র এবং পূজনীয় মনে হতে পারে
তাই বলে আমাকেও কি নতজানু হতে হবে ঐসব দ্রব্যের কাছে?

আমি একজন রেডম্যান,
শ্বেতাঙ্গ ভাই হিসেবে তোমাকে দেখি
তাইতো নিঃসঙ্কোচে বলছি:
পাপ আর পঙ্কিলতা থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য
ব্যগ্র হ'য়োনা –
বরং নিজেদের কিভাবে রক্ষা করবে সে কথাই ভাবো।।

আদিবাসী কানাডিয়ান কবি, সাংবাদিক, কর্মী, ব্যবসায়ী, অভিনেতা এবং প্রশাসক ডিউক রেডবার্ড ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম অন্টারিওর সুগীন ফার্স্ট নেশনসে (Saugeen First Nation) Ojibwe গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। কানাডার আদিবাসী সাহিত্যের বিকাশে তিনি অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত।

ঘরে আগুন লেগে রেডবার্ডের মা মারা যাওয়ার পরে নয় মাস বয়স থেকে তিনি 'চিলড্রেনস এইড সোসাইটি'র তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। ককেশীয় পালক পরিবারে যে অবদমন আর স্কুলে নিষ্ঠুর বর্ণবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার মোকাবিলার উপায় হিসাবে মূলত তিনি লেখালেখি শুরু করেছিলেন।

ÔI Am CanadianÕ, 'Loveshine and Red WineÕ, 'We Are MétisÕ তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

হেডলাইট

উৎসর্গ: শিল্পী আব্দুস সালাম

বেনজামিন রিয়াজী

ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো নিমাই রাস্তার ধারে। সারারাত তাড়ি খেয়ে ভোরবেলায় ভাটি থেকে বাটীর পথে হাইওয়ে পার হয়ে ঘন কুয়াশার ভেতরে মেথরপট্টির গলিটা খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নিমাই। 'শালা এত কুয়াশা', ভাবছিল । একবার মনে হলো সব কুয়াশা তার চোখে। বুঝতে, চোখ তুলে তাকালো চারদিকে। ঠিক তখনি চোখ থেকে সমস্ত কুয়াশা কেটে যেতে দেখল নিমাই। উজ্জ্বল বড় বড় একজোড়া চোখ কুয়াশার আবর্তে মেলে ধরেছে নতুন মায়াবী এক লীলা। নিমাই হেডলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে চোখে প্রত্যাদেশ নিয়ে হাত বাড়িয়ে তর্জনী উর্ধ্বমুখী করে হেঁকে উঠলো- 'রুখ যাও' । ঠিক তখনি ট্রাকটি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে রাস্তার পাশে।

রাগে চান্দি জ্বলে গেল নিমায়ের। জীবনে এই প্রথম শালার গাড়ী শুনলোনা তার হুকুম। 'লটির ব্যাটা, এত সাহস, নিমাই সন্ন্যাসীর হুকুম অমান্য!' নিমাই একবার ভাবে উঠে তেড়ে ধরে শালা ড্রাইভারের পাছায় কষে দুই লাথি। 'যা মাপ করে দিলেম'- ভেবে নিমাই নিমগ্ন হলো আবার ঘন হয়ে ঘিরে আসা ভারী কুয়াশার শাদা অন্ধকারে জমে ওঠা অভূতপূর্ব খেলায়।

নেশা তার আগেও ধরেছে সহস্র দিন সহস্রবার। কিন্তু এমন নেশা জীবনে লাগেনি। এ আনন্দে সে ক্ষমা করে দিল যার যতো অপরাধ, মগজের মায়ামদির মমতায়। 'আজব কারবার'। কুয়াশার পরে কুয়াশার স্তর ছায়াছবির মতো উন্মোচিত হতে যাকে তার সামনে। জন্ম থেকে শুরু করে যতো স্মৃতি যতো কথা যতো মানুষ যতো দৃশ্য দেখা অদেখা যতো জগৎ যতো গল্প যতো গান পশুপাখি মাঠ ঘাট আকাশ নদীনালা ফুল ফসল সব একসাথে জীবন্ত হয়ে উঠলো তার চোখে। চোখ ছাড়া যেন তার কিছুই নেই। হাত পা শরীর নেই। ধাক্কা খাওয়ার ব্যথাও নেই। চোখ শুধু চোখ। যেন সে ঐ ট্রাকের হেডলাইট খুলে লাগিয়ে নিয়েছে তার চক্ষু কোটরে। শুধুই একজোড়া চোখ যেন সে এখন। 'হুঁ, হারামজাদা ট্রাক, হইচ খুব চালাক। একন বুজবি মজা। নিমাই ব্যাঁকা না সোজা। শালা তোর চোক আমি নিছি খুলে। বাপের নাম যাবি ভুলে। কানা শালা আন্দা শালা মরগে এবার আন্দারে।' নিজের কবিত্ব শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি দিব্যশক্তি সব খুলে যায়। তবে নিমাই অবাক নয় মোটেও। তার হেডলাইট চোখে ডার্করুমে ফটো-কাগজের উপর যেভাবে কুয়াশাচ্ছন্নতা ছিঁড়ে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয় ছবি- তেমনি শীতের নির্জন ভোরে শিবপুর বাজারের হাইওয়ের ধারে পড়ে থাকা নিমায়ের চোখে তার শৈশব হতে অদ্যাবধি যতো ছবি সব জীবন্ত হয়ে ওঠে-

কুয়াশা চিরে ফুটে ওঠে পুরোনো শিবপুর বাজার- সারি সারি টিনের চালার দোকানপাট। রাস্তার দুপাশে- বিশাল ছায়ার রেনট্রি গাছ হতে ফুল পাতা, ফল ভাঙ্গা শরুডাল ধুলোবালি চালার উপর জমে মরচে পড়া। চাঁদসী ডাক্তরের ঘর, রমেশের মুদিখানা, গরুহাটা, ধানহাটা। পানহাটার বটগাছ-ডালপালা বেড়ে উঠছে- ঝুরি নেমে নেমে ছেয়ে নিচ্ছে স্কুলের মাঠের এক পাশ। এই গাছ সেদিন লাগালো মেম্বার- তার চোখের সামনে। স্কুল পালানোর পথে তার সামনেই গাছটা লাগাচ্ছে মেম্বার-পানি দিচ্ছে- ডালপালা ছড়াচ্ছে- ঝুরি নামছে। জুড়ে নিচ্ছে স্কুলের মাঠ - ভারী মজার ছায়াছবি আজ নিমাইয়ের চোখে। হা হা করে হাসে নিমাই- 'বাবু কী বুকা। তাক কিনা পাটায় ইসকুলে! নিমাই সন্ন্যাসীর নামে নাম রাকলো। আবার তাক পাটালো ইসকুলে-,' হাসির দমকে চারদিক থাকে লাফাতে-

স্কুলে গিয়ে বসেছিল বেঞ্চে, ঠসা কাসেমের ছেলে মুকুলের পাশে। বামে গোবিন্দ। ঢং ঢং , টিন টিন ঘন্টার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে নিমাই শুয়ে শুয়ে এই শীতের কুয়াশায়। ঐ দিনও ছিল শীতকাল। হেডলাইট ফেলে নিমাই দেখে ক্লাশ শেষ হলো। গোবিন্দ বলে 'শালা তুরা তো মেথর। কামের আগে নাকি তুরা মাল খাস যাতে গন্ধ না লাগে নাকে'? নিমাই তখনো মেথরের কাজ ধরেনি। তবে বাবুর সাথে যেত মাঝে মাঝে পায়খানা সাফ করতে। পাটকুয়ার মতো গর্ত ভর্তি মল। তার বাবু বালতিতে করে তুলে তুলে

পাশে করা গর্তে ঢালছে। 'তু যা নিমাই গোন্দ লাগবে,' বলে বাবু। হেডলাইটের কী মহিমা- ঐ গন্ধও মিষ্টি লাগছে এখন। 'তুর লাগেনা?' বলে নিমাই। বাবু হাসছে-কি সুন্দর পানের দাগে সাদা কালো লাল হলুদ দাঁত, বলে 'ছোটলোকের পাইখানা, গোন্দ তো লাকবেই। একি আর রাজার পাইখানা।' নিমাই বিস্মিত হয়- 'রাজার পাইখানা তু দেকেচিস?' বাবু গল্প শোনায় যে তার বাবা ছিল রাজবাড়ীর মেথর.... ছোটবেলায় তার বাবার সাথে যেত রাজবাড়ীতে পাইখানা সাফ করতে। রাজা খেত কস্তুরী দানার পান- তাই পাইখানার কি সুগন্ধ! এমনি কত আশ্চর্য গল্প।

মুকুল বলে 'নিমাই' তুই মালের ভাটিতে গেছিস কোনদিন? চ, আমরা যাই- মাল খাই'

নিমাই হেডলাইট চালায় বুড়ির ভাটিতে তার প্রথম সন্ধ্যার দৃশ্যপটে। ধুলিধূসর পটভূমি দানা দানা বালুকণার মতো ঘনীভূত হয়। পুঠিয়া রাজবাড়ীর মন্দিরে দেয়ালের টেরাকোটায় গ্রন্থিত দৃশ্যগুলো জীবন্ত হয়ে উঠলে যেমন দেখায় তেমনি। আসরের মাঝে রাখা গনগনে কেরোসিন কুপি, শীর্ষে কালচে কমলা জিহ্বা লকলকিয়ে ওঠে। যার চারপাশে ঘিরে বসে আছে লোকগুলো। গেলাস, ভাঁড়- বিড়ির ধোঁয়ায় আর তাড়ির গন্ধে ভারী হয়ে আসা চটচটে বাতাস। তারা তিনজন ঘরে ঢুকতে সাহস পায়না। ঘরের পেছনে অন্ধকারে গোপন জায়গায় বসে। ভাটির মালিক নামেই বুড়ি। কালো বিশালকায় জোয়ান মেয়ে মানুষ। একটা ছোট অনুজ্জ্বল কুপি হাতে মাল দিয়ে যায়- ওরা খেতে থাকে। খেতে থাকে। খেতে থাকে। গ্লাস গ্লাস, ভাণ্ড ভাণ্ড, মন মন, পুকুর পুকুর- নদী নদী- তাড়ির স্রোতে ভেসে যায় স্কুল। আরো ইয়ার দোস্ত ঐ স্রোতে ভাসে- কেউবা ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় অজনায়।

বড় বুড়ির ভাটির অদূরে গড়েছে ছোট বুড়ি নতুন ভাটি- সেখানে পিছনের অন্ধকারে নয়- নতুন বাঁশের নতুন বেড়ার নতুন বড় ঘরের মরদ কাস্টমার এখন তারা। ভাঁড়ে কচি বুড়ির গেঁজে ওঠা রসের উপচে পড়া ফেনা। ঘাড়ে সিংহের কেশর।

স্কুলের পাঠ কবেই গেছে চুকে। নিমাই হেডলাইটে ফোকাস মারে নিজের উপর। সিনেমার মতো স্লো মোশনে দৌড়াচ্ছে সে। দৌড়াচ্ছে আর বড় হচ্ছে। গোঁফ দাড়ি গজাচ্ছে। চুলের লতা লকলকিয়ে নামছে। সারা বিকাল তেল লাগায় চুলে। সিঁথি কাটে। গোঁফ শানায়। গাল ফুলিয়ে দাড়ি চাঁচে। গলায় মাফলার পেঁচিয়ে ফুঁক ফুঁক বিড়ি ফুকেঁ চক্কর মেরে সন্ধ্যা নামায় শিবপুর বাজারে; নামলেই বুড়ির ভাটিতে। ওরে কি আলোরে। বুড়ির ঘর ধাঁধিয়ে যায়। জ্বল জ্বল করে। শালার এমন পাওয়ার হেডলাইটের। সব দেখতে পায় নিমাই। পেটে মাল পড়ল- আমি হলেম রাজা; নিমাই ভাবে। 'রাজ মেথরের বংশ, রাজা ছাড়া কী!' মেজাজ রাজসিক। আলোর রশ্মি বল্লমের মতো ঊর্ধ্বভেদী সারিবদ্ধ সুতীক্ষ্ণ- ছোট বুড়ির নাকফুলে ঠিকরে ওঠা দ্যুতি- হাতে স্বর্ণভাঁড় থেকে তাল-তমালের ছায়ামাখা অমৃতরসের তাড়ি ঢালছে- 'খা নিমাই খা- জলে ভেসে যা। রাজার মান কেউ রাকলো না!' রাজারা কোথায় হারালো। রাজমন্দিরের দেবীর চোখ থেকে মনি মরকত খুলে নিল তস্করে। নিতাই সুইপারের বংশধর হলো মেথর পট্টির মেথর। হায়ওে, এমন অচেনা হতাশায় হঠাৎ 'মা মা' বলে চিৎকার দিল সে? চারদিকে তাকালো। বুড়ির কোমরে রুপোর বিছায় নামলো কী

অন্ধকার। রাজসিক মেজাজে তামসিক তাড়ির তলানি।

ভাটি থেকে বেরিয়ে আজ মেথর পট্টিতে ফিরতে ইচ্ছা করেনি। সে তখন দুঃখরাজ। প্রাচীন প্রাসাদের গাঁথনির ঝরে পড়া সুড়কি দানার মতো কণায় কণায় ঝরছে তার কঠিন দুঃখরস। দুঃখের রক্তলাল সমুদ্রে স্নান শেষে পাখা মেলবে সে নীলকাশের নিরুদ্দেশে-

নেশার মৌজে রাস্তায় বুক চিতিয়ে হাত মেলে ধরে চলন্ত গাড়ী থামানোর চিরন্তন খেলায় আজ তার মন হয়তো পরিপূর্ণ সাড়া দেয়নি। সে মেথর পট্টির গলিমুখে দাঁড়িয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিল? তাই কি আজ থামেনি চলন্ত গাড়ীটা? ফিরে যেতে চেয়েছিল এমন কোথাও যেখান থেকে আর কখনোই ফেরা যায়না।

বাজারের লোকগুলো এতসব বুঝবে কি করে? কুয়াশার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে একজন কাছে এসে দেখে পড়ে আছে নিমাই। দেখে চিৎকার দিলে আরো কজন জড়ো হয়। কেউ বলে 'আহা!' কারো ভয় ধরে রক্ত দেখে। আঁশটে গন্ধে কারো বমি আসে। 'জানতাম এমনই হবে- লাটসাহেব, রাস্তার গাড়ী থামাও!' নিমায়ের 'রুক যাও' নামক মাতাল খেলায় যারা আজীবন মজে উঠতো তাদের কেউ কি তার এমন পতনে নিষ্ঠুর গোপন আনন্দে শিহরিত?

তারা খুব কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ডাকে নিমাই- এ নিমাই- শুনচিশ- ওট, ওট...

নিমাই একপলক চোখ খুললে হেডলাইটের তীব্র ঝলকে আকাশ ধাঁধিয়ে যায় কিনা লোকগুলো বোঝেনা। পারবি; উটতে পারবি, ওট ওট'- তাদের চোখের পেছনে অন্ধকারে লুকানো নিরব নির্মম মমতাময় কোন কৌতুক ছিল কিনা কে জানে?

তবে নিমায়ের ঠোঁটে চিরায়ত মদমত্ত পতনের অহংকার ভরা এক চিলতে বাঁকা হাসির আকর্ষণে সবাই ঘন হয়ে আসে-

বলে 'ওট ওট । নিমাই উটে দাঁড়া।'

নিমাই বলে ' নিমাই উটতে পারে, লেকিন নিমাই উটপেনা'।

অশ্রুনদীর সুদূর পারে

রুখসানা কাজল

১

দূর্যোধনদাদুর কবিরাজ ঘর আমাদের নিরাময় ফার্মেসির পাশেই। পাশে মানে দোকানসমেত নিরাময় ফার্মেসির এই জায়গাজমি আসলে দূর্যোধনদাদুরই ছিল। ঘটনা হলো, বাপির সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়ে আমার নানাজান দেখলেন, আরে সব্বোনাশের মাথায় বাড়ী! করিছি কি! জামাই দেখি ভাদামের মহাসেনাপতি! আজ নাটক তো কাল সিনেমা। পরশু কবিতা তো তারপর দিন ফুটবল! এ তিনি কী করলেন! তার সোনার প্রতিমা যে ভেসে গেলো মধুমতির জলে!

তার মেয়েও বড় স্বাধীনচেতা। নিজের হাতে টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করার অভ্যাস আছে। কিন্তু জামাই তো ফকিরস্য ফকির। বাবার সম্পত্তি ছাড়া একেবারে ফুটো মান্দাস। বয়েস কম। যখন তখন কলকাতা ছুটছে। কলেজের খাতায় নামকাওয়াস্তে

নাম আছে বটে তবে জামাই ঘুরে বেড়ায় নাটক মহলে, কবিদের আড্ডায়। চিকন মোটা দেশি বিদেশি বইয়ে তার ঘর ভরা। সংসারের সং সাজতে তার ভীষণ আপত্তি।

ওদিকে মেয়েও কম যায় না। মহা ফাদামেশ্বরী। সেও বই কেনে, পত্রিকা আনায়, হিরোইনদের মত শাড়ি চুড়ি কিনে ফারপো হোটেলে লাঞ্চ করে। ইচ্ছে হলে লাফ দিয়ে ট্রেনে ওঠে চলে যায় হাওড়ার ভাড়া বাড়িতে। দুটোই উড়নচন্ডী। দিনরাত চইমক্কর চই চই। ঘুরছে তো ঘুরছেই। সংসার ঠনঠনে বেলতলা। তো এখন কি করা! নায়েবি বুদ্ধিতে তিনি দূর্যোধনদাদুর সাথে পরামর্শ করে মা বাপিকে ঘরবন্দি করার লাগসই বুদ্ধি আঁটলেন। দূর্যোধনদাদু তিনটে দোকান সমেত জায়গাটা বিক্রি করে দিলেন আমার নানার কাছে। উদ্দেশ্য বাপিকে ওষুধের দোকান করে স্থিতি স্থাপন করা।

তখন ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে এক অসুখ। তার নাম দেশভাগ।

এই অসুখে সমানভাবে পুড়ে যাচ্ছিল অনাদিকালের সম্পর্ক, ঘরবাড়ি, গরুছাগল, জনমানুষ, জোত জমি, হিন্দু মুসলমান, আমার মা বাবাও।

পোড়া হৃদয় নিয়ে ওরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে প্রিয় কলকাতা ছেড়ে নিজ শহরে। আর দাদুর পরিবারের সবাই বাপ পিতামোর ভিটে, ঘরবাড়ি, পুকুরজমি বন্ধুদের ছেড়ে পুড়তে পুড়তে চলে যায় ইন্ডিয়া নামের অচিন অন্যদেশে।

দূর্যোধনদাদু থেকে গেলেন। একা। কিছুতেই তিনি দেশছাড়া হবেন না। তেমনি কিছুতেই তাকে দেশ ছাড়া করা সম্ভব হলো না।

চালতা পেকে হলুদ হয়ে থাকে। পাছ পুকুরে মাছেরা বুড়বুড়ি তুলে ফেনা করে ফেলে পানি। আদুর বাদুররা পেয়ারা খেয়ে ঝুলে থাকে গাছে। তিনি ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে রংপুরের পাকা তামাকের হুক্কা টানেন আর সবাইকে সচকিত করে কড়া পাহারা দেন। কাউকে ঢুকতে দেবেন না তার পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি আগান বাগানের ত্রিসীমানায়।

সেই সময় কেউ একজন নাকি দাদুর কবিরাজ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ঠারেঠুরে বলেছিল, ও কাকা দেশের যা অবস্থা দেখতিছি! পারলি চলি যান না কেন? এই বয়সে ছেলেমেয়ে আপনজনের কাছে থাকাই ত ভালো! শুধুমুদু পরের দেশে পড়ি আছেন কি সুখে শুনি!

রামদা তুলে দাবড়ে গেছিল দাদু, ওরে শুয়োরের বাচ্চা শুয়োর, চুতমারানির ছাওয়াল কয় কি! ধরতি পালি তোর ফল্লা কাটি দুভাগ করি দিবানি। শালার শালা চুতিয়া শালা তুই আইছিস আমারে কিবলা দেখাতি! কোহানে গেলি অই কুত্তার বাচ্চা, গুখোরের দল! আয় সামনে আসি ক দেহি আবার এই কথাগুলান!

নারকেল গাছের গুঁড়ির মত কালো, ঢ্যাঙ্গা, আবার পেটমোটা দাদু মাথার উপর রামদা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আধা মাইল পথ ধেয়ে গেছিল লোকটাকে ধরতে।

বাপিসহ আরো অনেকেই ছুটে এসে থামিয়েছিলো দাদুকে।

ততক্ষণে সেই লোক খাটরার খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ওঠে গেছিল ওপারে। মাথার টুপী ভেসে গেছে খালের পানিতে। নাগরা জুতাও পানির অতলে।

তিন তালগাছের ঘাটে নীল পাঞ্জাবীর কোচড় চিপড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে লোকটা নাকি

খালি হাত বাগিয়ে বলেছিল, মিলেঙ্গে মিলেঙ্গে ফের মিলেঙ্গে কাকা।

তারপর বাপির দিকে ঘুষি বাগিয়ে ভয় দেখিয়েছিল, ওরে কাইজার দেখবানি কতবার তুই অই বুড়োকে বাঁচাতে পারিস। তোর একদিন কি আমার একদিন!

বাপি ভিলেজ পলিটিঙে একেবারে ভোদাই। মানুষকে পালটি ভয় দেখাতে ডাহা বোকচোদ।

নীলপাঞ্জাবীর খালি হাতের ঘুষির ধমক দেখে থতমত খেয়ে কিছু না বলে দাদুকে ধরে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ছিল। রক্তলাল চোখে দাদু তখন মরিয়া। অন্যেরা দাদুর হাত থেকে রামদা ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে এসেছিল আমাদের এক চিলতে শহরে।

আর বাপি সে রাতে কবিতা লিখেছিল, মানুষের মানবতার স্খলন নিয়ে। তাতে শিশিরের মত চুইয়ে পড়েছিল অপ্রমিত বেদনার চুরচুর চূর্ণতা। মানুষ কেনো এত নীচ হয়!

একমাত্র বাপির কাছেই দাদু পোষ মেনে যেত। মাঝে মাঝে আফিং খেয়ে হু হু করে কাঁদত, কাসু আমার মুখাগ্নি কিন্তু তুই করিস বাপ।

বাপি হ্যা হু করে শান্ত করত দাদুকে।

ভালো করেই জানত এটা করলে জবর দাঙ্গা হাঙ্গামা হতে পারে। হতে পারে কী! হবেই। বাপি তাই দূর্যোধনদাদুর এক গরীব দূরের আত্মীয়কে খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছিল। তাকে নিরাময় ফার্মেসিতে চাকরি দিয়ে রেখে দিয়েছিল ধারে কাছে।

আমার মার আবার চড়ুই বুদ্ধি। বাপির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একটু খুঁচে দিয়েছিলো, হ্যাঁগো, বুড়ো মানুষটার সাথে সত্যনাশ করবে? তুমি কী তবে ভেড়া হয়ে গেলে আজন্মের ব্যর্থ কবি?

বাপি অখন্ড ভেড়াতত্ব মেনে নিয়ে মাকে হেসে বলেছিল, শান্তি শান্তি। ওম শান্তি। সবকিছু এত সোজা নয় রে পাগলি!

২

খুব ছোটবেলায় কাঁঠালপাতায় দেওয়া একচামচ আচারের মত কবিরাজি ওষুধ চেটে খেতে খেতে দাদুর কাছে আমরা গল্প শুনতাম, ক্লিওপেট্রা, নেপোলিয়ন, ট্রয়যুদ্ধ, হিটলার, কলম্বাস, নবাব সিরাজউদ্দোলা, মীর জাফর, গান্ধী, নেহেরু, জিন্না, মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা, ইলা মিত্র, একাত্তর আর সোভিয়েত রাশিয়ার।

কালো কুচকুচে রঙে লাল টুকটুক ঠোঁট, পানসুপারি আর খয়ের জর্দার অদ্ভুত মাদক গন্ধ। একটার পর একটা চলত পান খাওয়া আর তার সাথে গল্পকথা। মাঝে মাঝে গল্প থামিয়ে একটা ছোট্ট সবুজ গামছায় মুখ মুছে নিতেন দাদু। এই সামান্য ক্ষণের বিরতিও আমাদের ভালো লাগত না। বিচ্ছু শয়তানের মত হামলে পড়ে কেবলই জানতে চাইতাম, তারপর? ও দাদু তারপর?

বাপি এসে মাঝে মাঝে বকে যেত, আবার জর্দা খাচ্ছেন? আপনি তো দেখি কোনো

কথাই শোনেন না। সোমেনকে এবার বলে দেবো আর যেনো জর্দা না পাঠায়।

দাদু আগুনমুখো হয়ে ঠা ঠা করে হেসে উঠত, ইসসি রে! আমার কলকাতার হাফ সাহেব আসি পড়িছেন। ও কাসু মিলিটারিগে গুলি খায়িও আমি মরি নাই। পান জর্দা খর আমার কিস্যু করতি পারবি নানে বাপ।

বাপি অবশ্য তখনো জানে না, মাও চুপি চুপি দাদুর কাছে পান জর্দা খাওয়া শিখে নিচ্ছে।

প্রায়ই সন্ধ্যার সময় মা, মাহমুদা ফুপি, হাসিনা ফুপি, মম আন্টি, আরতি মাসি, লক্ষ্মীদি দাদুর কাছে এসে জর্দা দিয়ে পান খায় আর পুরোনো আমলের গল্প শোনে।

বুঝলে বউমা, ১৯০৯ সালি গোপালগঞ্জ মহকুমা হইছে। তার কিছু আগে আমি জন্মিছি। জলজংলা, খালবিল, নদীনালা, হাঙ্গর কুমিরে ভরা ছেলো এই জায়গা। কি নদী ছেলো এই মধুমতি, ভাবতি পারবা নাকো তোমরা। এই এত বড় বড় ঢেউ। বজরা বলো, গয়না নাও, পিনিস যাই বলো মধুমতি ক্ষেপি উঠলি সবাইরে গিলি গিলি খায়ে ফেলাতো। দিনে দুপুরে কুমির পায়ি হাঁটি গিরস্তের বাড়ি ঢুকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির সাথি আতকা হামলা করি বউ বাচ্চাও টানি নিয়ি যাতো। চারদিকি খালি জল জল জল। নৌকো করি এবাড়ি ওবাড়ি যাতাম আমরা। একবার হইছে কি, এক জমিদারের মাইয়ের বিয়ে। বর আসি গেছে। এদিকে ঘোর কাদাপানিতে রাস্তা গেছে ডুবি। বর তো আর নামতি পারে না। লগ্ন প্রায় যায় যায়। শেসি জমিদার করল কি, গোলা খুলি রাশি রাশি ধান বিছায়ে দেলো অই কাদাপানির রাস্তায়।

আমরা পড়াশুনা ছেড়ে ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে দু একটা পানের বোঁটা লুকিয়ে কুড়িয়ে খেয়ে নিতাম আর দেয়ালের গায়ে হাতের ছায়া ফেলে ফেলে নানা রকমের ছবি বানিয়ে খেলা করতাম।

গল্প শুনতে শুনতেই দেখতাম মা চাচি, মাসিদের মুখ হাসিতে চকচক করে ওঠেছে। আর দাদুকে মনে হত বাসি ফুলের সিংহাসনে বসে আছে আদ্যিকালের গল্পরাজা। সবুজ গামছাটা হচ্ছে পান্নার মালা। মাথায় মুকুট নেই তাতে কি! দাদু আমাদের রাজার রাজা।

মাঝে মাঝে মায়েরা এমন ছোটমানুষের মত হই হই করে উঠত যে আমরাও জমে যেতাম ওদের সাথে। দাদু মিটিমিটি করে হাসত আর জোড়া সন্দেশের থালা দেখিয়ে চোখের ইশারা করত, নে নে তাড়াতাড়ি আরেকটা নিয়ে নে।

দাদুর কবিরাজঘর আমাদের দখলে থাকত সব সময়। বিনা পয়সায় দাদু আমাদের পড়াতেন। কুচোরা পড়ত একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র। আমরা পড়তাম, কোথ ায় চলেছ, এদিকে এসোনা, দুটো কথা বলি শোন কিম্বা বর্ষার জল সরিয়া গিয়াছে, জাগিয়া উঠেছে চর----।

আমরা কখনো পড়ি, কখনো অংক, ইংরেজিতে গোল্লা পাওয়া পরীক্ষার খাতা ছিঁড়ে নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিই কালিবাড়ির পুকুরে।

হেটো ধুতি, খালি গা, পা ঢাকা স্যান্ডেল সু পরে দাদু লম্বা কঞ্চি দিয়ে নৌকাগুলোকে মাঝ পুকুরের দিকে ঠেলে ঠেলে ভাসিয়ে দিয়ে বলতেন, চেঁচা, চেঁচা ।

আমরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতাম। কোনো কোনো নৌকা ডুবে যেতো তাড়াতাড়ি, আমরা চেঁচিয়ে ওঠতাম, গেলো গেলো ভুট্টো গেলো কিম্বা ডুবিছে রে ডুবিছে, ইয়াহিয়া ডুবিছে। দাদু হাসত, চেঁচা, চেঁচা, যত চেঁচাবি তত লাংস ভালো থাকপি। অই অই ডুবে গেলো আরেকটা! চেঁচা, চেঁচায়ে ক' হেইয়ো হেইয়ো ডুবিছে রে ডুবিছে আম্রিকা ডুবিছে।

দাদু আমাদের বুদ্ধিদাতাও। পরিক্ষার খাতায় তেত্রিশকে তেপ্পান্ন কিম্বা চল্লিশকে উনপঞ্চাশ করা দাদুর বাঁ হাত কা খেল ছিল ।

কিন্তু আজকাল কেমন খিন্ন হয়ে যাচ্ছে দাদু। কুঁজোও। যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ে। ধুতি উঠে যায় এদিক সেদিক, আর ঘরমোছা শেষে চিপড়ে রাখা ন্যাকড়ার মত দেখা যায় দাদুর পুরুষাঙ্গ। নেতানো, কালো আর বিশ্রী সাদা চুলে ভরা।

আমাদের বিব্রত মুখ দেখে বাপি বলেছে বুড়ো বয়সে ওরকম হয়। লজ্জা কি! তোমাদেরই দাদু তো। না হয় একটু টেনে দিও ধুতিটা। ভালোবাসায় মায়া রাখতে হয় জানো ত মামণি। কত ভালোবাসে তোমাদের! মানুষের জন্যে মায়া করতে শেখো মা।

তা ঠিক। আমরাও দাদুকে খুব ভালোবাসি। তাই যে যখন থাকি, আমরা ঠিকঠাক দাদুকে ঢেকে দিই। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় লজ্জা দেয় ওপাড়ার বন্ধুরা। আকরাম, নান্টু, রেন্টু, মুরাদ, আলতাফ জানালার লম্বা শিকের মাঝে মাথা গলিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসে আর আমাদের ক্ষ্যাপায়, অই তোদের দাদুর চিন্টু দেখা যায় রে!

আমরা মারতে যাই, আচ্ছা আচ্ছা তোদের চিন্টুও দেখা আছে। বুড়ো হ তোদের চিন্টুও এমন হয়ে যাবেনে!

ভয়ে ওরা তাড়াতাড়ি যে যার প্যান্টের চেন খুলে দেখে নিশ্চিত হয়, না বাবা এখনো ঠিক আছে।

শয়তানের শয়তান আকরাম শূয়োরের মত মুখে একটু মায়া এনে বলে, দাদুর বুকটা নড়তিছে না কেনো রে? শিগগীর দেখ তো নিঃশ্বাস চলতিছে নাকি!

তাই শুনে পাড়ার মাস্তান মিল্টন ভাইয়া সাইকেল ফেলে একলাফে ঘরে ঢুকে পড়ে, এই তোরা সর, সরে দাঁড়া শাকচুন্নির দল।

তারপর দাদুর বুকের উপর কান রেখে চোখ বন্ধ করে শ্বাস শোনে। একটু পরেই হেসে উঠে ভালো ছেলেদের মত, হুম বুকটা নড়তিছে। শ্বাস নিতিছে দাদু। বাঁচি আছে বুঝিছিস পিচ্চিপাচ্চার দল। তারপর দুই হাতে চোখ মুছে চেনা চেহারায় চেনা গুন্ডাদের মত খিস্তি করে, শালার বুড়ো! মরলি কিন্তুক তোর মাথা ফাটায়ে আবার জেলে যাবানি কথাটা য্যান মনে থাকে!

মিল্টন ভাইয়া চলে যেতে গোলাম মোস্তফার বাগান থেকে চুরি করে আনা একটা পাকা মালদা পেয়ারা বের করে দেয় আজাদ, দাদুকে দিস।

রেন্টু দাদুর ফোনের দিকে তাকিয়ে বলে, কিছু হলি ফোন দিবি। আমরা সাথি সাথি চলি আসবানি। ফোন নাম্বার জানিস তো?

জানি আমরা। এই শহরে কজনের বাসায় আর ফোন আছে! দরকারে সবাই দাদুর কাছে না হয় ওদের বাসায়ই ফোন করতে ছোটে।

৩

ওরা চার পাঁচজন প্রতিদিন আসে। প্রতিদিন এরকম কথা হয়। কিছুক্ষণ থেকে ওরা চলে যায়। ওদের থেকে খবর পায় আমাদের ছোট শহরের অনেকেই। কেউ কেউ সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানায়। কেউ কেউ ঠোঁট চেপে রাগ দেখায়, বুড়ো শালিকটা এহনো বাঁচি আছে। কতবার কলাম জায়গাটা বিক্রি করি দিতি। আমার মেয়েজামাই কুয়েত থেকি আসি শহরেই বাড়ি বানাতে চাতিছে। তা বুড়ো কিছুতেই রাজি হতিছে না।

এরপর গভীর কূট আলোচনায় মাথা নিচু করে ফিসফাস করতে শুরু করে। জায়গাটা কি শেষে ওরেই দিয়ে যাবি নাকি। এটা কিছুতেই হতি দিতি যাবে না, ও পেশকার, একটা বুদ্ধি বার কর দেখি। কাক শকুনে নেওয়ার আগি বুড়োর ছেলেদের এখনি একটা খবর দেও দিকিন, আমরা নগদা নগদি ডাবল দাম দিয়ি কিনি নেবানি!

চায়ের দোকানে অনেকগুলো ময়লা টাকা বের করে দিয়ে চা খায় আর কূট আলোচনায় মগ্ন হয়ে যায় ময়লা মনের মানুষগুলো। চাওয়ালা সুবল প্রতিদিন মাগরিবের নামাজের সময় এসে দাদুকে দেখে যায় আর বলে দেয়, ওরা কে কি ভাবছে। তাই শুনে দাদু দুলে দুলে হাসে।

সামান্য একটু পেয়ারা খেয়ে হুম হুম করে দাদু, শালারা তালি আসিছিলো। অইডাও? ও শালার দাদু কিন্তুক রাজাকার ছেলো জানিস ত তোরা। সাবধান। সাপের বাচ্চা কিন্তুক সাপই হয়।

তা হয়। খোন্দকার মুশতাক তো বঙ্গবন্ধুর বন্ধু ছিল। আমার মা ত বঙ্গবন্ধুর সাথে তোলা গ্রুপ ছবিতে খোন্দকার মুশতাককে দেখিয়ে বাপিকে বলেছিল, এমা, দেখো দেখো সত্যি কেমন নাথুরাম গডসের মত লাগছে চেহারাটা!

আমরা নাথুরাম গডসেকেও চিনতাম। দুপুরে দাদুর ঘরে সিলিং ফ্যানটা কোরাঞ্চো কোরাঞ্চ, কোরাঞ্চো কোরাঞ্চ শব্দ করে চলত আর তার নিচে শুয়ে বসে আমরাও নাথুরাম গডসে আর খোন্দকার মুশতাকের চেহারায় আশ্চর্য মিল খুঁজে পেতাম! কেবল হিস্ট্রি বইয়ে দেওয়া লর্ড ক্লাইভ আর মীরজাফরের স্কেচটা কিছুতেই মিলত না এদের সাথে।

দাদু বলত দূর পাগলের দল! কতরকমের খুনী আছে এই পৃথিবীতে তা জানিস! ও আকরাম সালাউদ্দীন ফকিরকে একবার দেখা করতে বলিস ত দাদুভাই।

সালাউদ্দীন ফকির হচ্ছে চার খুনের আসামী। প্রমাণ হয়নি বলে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। এই চুল ঝাঁকিয়ে যখন গান ধরে তখন মানুষ ভুলে যায় সালাউদ্দীন খুনিকে। একই লোক খুনি আবার গাতকও! বুঝলি মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণের প্রাণী রে। হরেক রঙের কারবারি এই মনুষ্য জাতি।

আকরামকে কিছু বলা মানে সাথে সাথে সে কাজ হয়ে যাওয়া।

সাইকেল করে আকরাম আর তুহিন সেদিনই চলে গেল ফকিরহাট। আখড়ায় সালাউদ্দীন ফকির নাই। চিতলমারির কোন গ্রামে গেছে গানের বায়না নিয়ে। আখড়ার মা, মানে সালাউদ্দীন ফকিরের মা জননী সর্ষে তেলে ভাজা কড়কড়ে ঝাল কইএর সাথে নিজের হাতে লাগানো লাউয়ের ছেঁচকি দিয়ে ভাত খাইয়ে তবে ছেড়েছে ওদের। দাদুর গেস্ট

বলে কথা।

তাছাড়া আকরাম ইদানীং মিল্টন মাস্তানের কমরেড হয়ে যাচ্ছে। কাউকে দেখা করতে খবর দিতে বললে, গলায় গামছা দিয়ে তখুনি ধরে প্রায় বেঁধে নিয়ে আসে!

দু ফলার একটা চাইনিজ চাকু কিনেছে আকরাম। আজকাল জামার কলার ভাঁজ না করে পরে। পড়াশুনার সময়ও ঘুরে বেড়ায়। কোচিং ফাঁকি দেয় প্রায় সব দিন। পড়াশুনাও ভাল করে করে না। দু পেপাওে ফেল করেছে। এসএম মডাল হাই ইশকুলের পান্নু স্যার আকরামের বাবাকে বলে গেছে, ফাইন্যালে ফেল করলে ইশকুল টিসি দিয়ে দেবে। অইটুকু ছেলে। এখুনি চেপে ধরেন উকিল সাহেব। সময় এখনো চলে যায় নি।

উকিলচাচার হাতে ডাবল বেতের মার খেয়েও ওর কিচ্ছু হয়না।

ওর হাতে পিঠে বুকে বেতের দাগ দেখে শিউরে ওঠে আমরা জোরে শোরে পড়তে বসি। কিন্তু যে আকরাম সেই আকরামই থাকে। ভালো আকরামকে আর দেখা যায় না। আমরা বুঝি ওর আর ক্যাডেট ইশকুলে পড়া হচ্ছে না। ও গোল্লায় গেছে নজু দারোগার বড় ছেলে মিল্টন ভাইয়ার মত!

৪

মিনতি মাসি একটি কালো ধাতব গামলায় পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, কাঁচামরিচ সর্ষে তেলে ডলে সামান্য চিনি ছিটিয়ে মুড়িমাখা দিয়ে যেত। তীব্র ঝালে আমরা শোষাতে শোষাতে চেঁচাতাম, এত ঝাল কেনো দিয়েছ গো মাসি। মরে যাচ্ছি প্রায়!

মাসি গামছায় ভেজা হাত মুছতে মুছতে রাগী গলায় খিঁচিয়ে ওঠত, মেয়েমানুষ ঝাল খাবা না ত খাবা কি! জীবনটা কি কেবল মিঠাইমন্ডায় ভরা থাকে নাকি!

তা বটে। আজই তো ইশকুলে দু দুটো বেতের বাড়ি খেয়েছি কৃষ্ণাদির কাছে।

থার্ড পিরিয়ডে সমাজ স্যার আসেননি বলে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন সাই সাই করে ক্লাশের সামনের পেয়ারা গাছে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে কয়েকটা পেয়ারা পেড়ে ফেলে দিয়েছিল নীচে। আমি ফার্স্ট ক্যাপ্টেন শেয়ালের মত সাবধানে তা কুড়িয়ে এনেছিলাম। কেউ দেখেনি আমরা ডাবল সিওর। সবে ক্লাশ শুদ্ধ সবাই ভাগ করে খেয়ে আনন্দ করছি, ওমা কৃষ্ণাদি এসে চটাস চটাস মেরে দিলো। আমরা নাকি ক্যাপ্টেনের কোনো জাতই না। নেক্সট উইকে নতুন ক্যাপ্টেন বানাবে। বানাক। তারাও আমাদের মতই জাত ছাড়া ক্যাপ্টেন হবে। কৃষ্ণাদিরা তো জানেনা, আমরা ক্লাশে ডেস্কের ভেতর কাপ আইস্ক্রিম রেখে ভাগ করে করে খাই। আমাদের ইউনিটি সুপার এঙওকিউ। ওসব একটু আধটু মারধরে আমাদের কিস্যু হয়না।

দাদু এক চোখ ছোট করে হেসে বলতেন, ঝাল খাবি বুঝলি। ঝাল হচ্ছে মানুষের আদি ও অকৃত্রিম ভরসা। যত ঝাল খাবি তত শুদ্ধ হয়ে উঠবি।

আমরা মিনতি মাসির কষ্টটা জানতাম। রেখাদির মা মিনতি মাসিমা এখন দাদুর কাছে থাকে। দাদুর সব কাজ করে দেয়। তাকে ভরসা দেবে, আশ্রয় দেবে, রেখাদিকে পড়াশুনা করাবে বলে দাদুর এক ধনী আত্মীয় তার সংসারে সম্মানের সাথে এনে

রেখেছিল বহু বছর ধরে। সেই বিশাল বাড়িতে মিনতি মাসিমার একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল। এমনকি বাড়ির কুকুরটাও মিনতি মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইত ঘেউ করে ডাকার জন্যে।

অনেক যত্ন করে সেই লোকের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে দিয়েছে মাসিমা। বঙ্গবন্ধুকে মেওে ফেলার পর তারা ইন্ডিয়া চলে গেছে। যাওয়ার সময় কিছুতেই সাথে করে নিয়ে গেলো না রেখাদি আর তার মাকে। দাদু অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিল। তারা দাদুকে বলে গেছিল, কি বলবো ওখানকার মানুষকে? বলবো যে আমার বাবা রাঁড় রেখেছিলো, ছিঃ।

অকথ্য গালাগালি করে দাদু ওদের তাড়িয়ে দিয়ে রেখাদি আর রেখাদির মাকে নিজের বাসায় এনে রেখেছিল। রেখাদি অবশ্য খুব ভাল আছে। বাপি মা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে নিরাময় ফার্মেসীর কমপাউন্ডার দাদুর সেই আত্মীয়ের সাথে। মাঝে মাঝে রেখাদি আসে ছেলেকে সাথে করে। রোগী বসার বেঞ্চে বসে ছেলেকে দুধ খাওয়ায়। ছেলেটা এক বুকের দুধ খেতে খেতে অন্যবুকের কাপড় উলটে দেয়। আর অবাক করা এক দুধের ভান্ডার আমাদের চোখের সামনে মুখ উঁচু করে হেসে ওঠে।

কী যে সুন্দর লাগে। আমরা বিমুগ্ধ হয়ে দেখি। ছেলেটাকে ছুঁয়ে দিই। গলার ভাজে তেল পাউডারের সর। কপাল জুড়ে কাজলের টিপ। কোমরের ঘুনসিতে রূপা বাঁধানো ঘুন্টি। ওর নরম কোমল চামড়ায় সর্ষে তেল আর পাউডারের ম ম গন্ধ।

রেখাদি যা বলে আমরা তাই করে দিই। মাঝে মাঝে রেখাদির নতুন লাল স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে ঘুরি। ইস কত বড়! আধখানা স্যান্ডেল বেরিয়ে থাকে। পেছন ফিরে বেরিয়ে থাকা স্যান্ডেল দেখি আর ভাবি, আমাদেরও একদিন বিয়ে হবে। আমরাও একদিন এমন লাল হিল তোলা স্যান্ডেল পরে বুক উজাড় করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবো!

দাদু বলেছে, হবেই। তোরাও ত মেয়ে। মেয়েরা হচ্ছে পৃথিবী। সন্তান না থাকলে কিসের পৃথিবী! আকরাম রেন্টুরা তাই শুনে ঠোঁট ওল্টায়, সে কোন জম্মে হবিনি কিডা জানে!

গোপনে গোপনে রেখাদির স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে পায়ের মাপ যাচাই করি। স্যান্ডেলের ফাঁকা অংশটা যেনো একটু কমে গেছে! জামার গলা ফাঁকা করে নিজেদের বুক দেখি। একটু কি উঁচু লাগে? ঘুম দুপুরে বড়আয়নার সামনে মার ছেড়ে রাখা ব্রা গায়ে চড়াই। ধুস কাপগুলো চুপসে ন্যাতাকানি হয়ে ঝুলে থাকে।

আর তখন অপেক্ষা নামে একটা শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। সব কিছু তারাপদ কাকুর দোকানের মিষ্টি নয় যে পয়সা দিলেই পাওয়া যাবে, এটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারি।

৫

আকরামরা বাচ্চাটাকে দেখে আর ফিসফিস করে, দেখতে কি সুন্দর লাগছে তাই না রে। গির্জায় আঁকা মাতা মেরির কোলে পিচ্চি যিশুর মতন।

আলতাফ পাশ থেকে বলে উঠে, এই আমাদের ধর্মের মত কথা বল। ঈসা নবীর মাতা বিবি মরিয়ম। মেরি বলিস না খৃষ্টানদের মত।

আকরাম রেন্টু একটু ভড়কে যায়।

আলতাফের বাবা আজকাল শহরের বেশ নামকরা উকিল হয়েছে। আগে গ্রামে ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক হিন্দু পরিবার বাংলাদেশে ফিরে আসেনি। তাদের কারো কাছ থেকে বাড়ি কিনে নিয়েছে। যে পাড়ায় বাড়ি কিনেছে সে পাড়ার হিন্দুরা আস্তে ধীরে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে আর বাড়িগুলো আলতাফের বাবা নিজের গ্রামের লোকদের নিয়ে কিনিয়ে নিচ্ছে।

আলতাফের বড়ভাই সোভিয়েত রাশিয়ায় স্কলারশীপ নিয়ে জলবিদ্যুতের উপর পড়াশুনা করছে। ওর আব্বার প্রাইভেট অফিসের দেওয়ালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরাট বড় ছবি। দরকার বেদরকারে শহরের অনেকেই আজকাল ভিড় করে সেখানে। এখন আর কেউ বলে না, এই উকিলের আব্বা একাত্তরে রাজাকার ছিল।

আমাদের ফার্মেসিতেও আজকাল মাঝে মাঝে এসে বসে। মোয়ানো মুড়ির মত মিইয়ে যায় বাপি। ভালো করেই জানে লোকটা তাকে উপরে উপরে সম্মান করে কিন্তু ভেতরে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

দাদুর জায়গাটা নিয়ে খুব ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। দাদু এখন বয়সের ভারে নির্বাক, স্মৃতিশক্তিহীন। শোনা যাচ্ছে জায়গাটা বিক্রি হয়ে গেছে। কার কাছে কেউ জানে না। একদিনের জন্যে দাদুর ছেলেরা এসেছিলো। তারাই বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। বাপির সাথে কোনো কথা হয়নি। চুক্তি হয়েছে দাদু মারা গেলে যারা কিনেছে তারা দখল নিয়ে নেবে।

উকিলসাহেব হেসে হেসে বাপিকে চাপ দিচ্ছে। তিনি আরো বেশি টাকা দিয়ে দাদুর জায়গাটা কিনতে চান। পজেশন ভালো। বাপি যেনো দাদুর ছেলেদের কাছে প্রস্তাব দেয় আগের বিক্রিটা বাতিল করে তার কাছে জায়গাটা বিক্রি করে দিতে। দরকারে বাপিকেও কিছুমিছু উপহার দেওয়া হবে। মিছরির ছুরির মত গভীর শ্লেষ ছড়িয়ে বাপিকে আঘাত করে আলতাফের আব্বা, কি পেলেন এ জীবনে? বঙ্গবন্ধু তো আপনার বন্ধু ছিল। কতকিছুই ত করলেন তার জন্যে। আল্লাহও ত আপনাকে মেরে দিয়েছে। কেবল কন্যা সন্তান আপনার। বাপি থম মেরে থাকে। যা করেছে তা দেশের জন্যে। কিন্তু এইসব লোক কি তা বুঝবে!

৬

এক আলো ছড়ানো পূর্ণিমার রাতে দাদু দেহ রাখলেন। হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছিল সে রাতে। শ্রাবণ জ্যোৎস্নাকে ঘিরে বৃষ্টিমেঘ তার বুকের পরত খুলে দিয়েছিল বাতাসে। বুকের খাঁজে খাঁজে সেকি মোহন মৃত্যু নাচ। ভয়হারা। দুঃখ বিচ্ছেদ কুণ্ঠাহীন। সদাশয়। মৃত্যু আলয়ে নেচে যাচ্ছে মানুষের প্রাণ, এসো এসো, এসো মরণ।

মোমের মত নরম মায়াবতী বৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছিল দাদুর উঠোন। চমকে চমকে ওঠেছিল হাস্নুহেনা আর গন্ধরাজের পাতা। ঝমঝম আবেশে জেগে ওঠেছিল প্রকৃতি। আলো

আঁধার, বৃষ্টি জল, বৃক্ষ নদী মাটি ও বাতাস রচিত করেছিল এক মহাপ্রস্থানের পথ। অবিনাশী জ্যোৎস্না আলো ছড়িয়ে মাঠ, ঘাট, গাছ, নদীর মত স্পষ্ট করে তুলেছিল সেই অলৌকিক বীথিকা।

ভিজে গাছ আর বৃষ্টির সেকি রোমাঞ্চ। নদী ফুলে উঠেছিল কলকল আনন্দে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজছিল মৃত্যু মেয়ের তন্নিষ্ঠ পা। আমলকি, শিরীষ, নিম অশোকে ছাওয়া মধু বাউলের আখড়ায় কে যেনো খোল বাজাচ্ছিল হৃতমান লয়ে, এসো এসো, এসো মৃত্যু। এসো এসো, এসো মরণ।

মিলটন ভাইয়া আরবদেশে উটের আস্তাবলে কাজ করে। ভাইয়ার চোখ এখন উটরঙা। মাঝে মাঝে কড়া রোদ্দুরে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। মরুভূমির বালু তা শুষে নেয়। শাওয়ালের চাঁদ দেখে ভাবে, এইযে বিদেশ যাপন, তা জেল থেকে আর কত ভালো হল! খেজুরের চামর ঝুলে পড়া দেখে গোপনে ফুঁপিয়ে কাঁদে, দেশ, আমার স্বদেশ। আমারে নিয়ে যা মা। আমার আর ভাল লাগে না এই মুক্তি।

সোমেন কাকুরা দাদুর জায়গা বিক্রি করার সময় দাদুর কাছ থেকে বাপির জন্যে কেনা জায়গাটাও কিভাবে যেনো বিক্রি করে দিয়েছে। আলতাফের আব্বার হাতে সব কাগজ। একেবারে অরিজিন্যাল। বাপি অনেকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সোমেন কাকুরা সাড়া দেয়নি।

মামলা লড়লে লড়া যায় কিন্তু বাপির সেই জোর নেই।

আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আকরাম, রেন্টুর সাথে আলতাফ এসেছিলো দেখা করতে।ও এখন আর্মি ট্রেনিং এ চলে যাবে বহুদূর। অনেক লম্বা হয়েছে। গোঁফ উঠেছে কালো হয়ে। যাওয়ার সময় একটু পেছনে পড়ে, থেমে বলেছিলো, ভুলে যাবে? আমরা কি এতই খারাপ!

পড়ার টেবিলে উপুড় হয়ে আছে মানিক বন্দোপাধ্যয়ের "পুতুল নাচের ইতিকথা"। কুসুমকে কেমন যেনো ভাল লেগে যাচ্ছে আমার। তার আগে শেষ করেছি গোর্কির মা। নাতাশার চাইতে সাশাকেই বেশি মনে ধরেছে আমার। দাদু আমার হাট্টাগোট্টা চেহারাছবি দেখে মাকে বলত, বড়বউমা তোমার ঘরে দেখি রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা জন্মেছে!

পুতুল নাচের ইতিকথার ভেতর মাথা মুখ লুকিয়ে আমি আমার আবেগকে খুন করি। আমার প্রথম প্রেম হিজলফলের মত পড়ে থাকে মাটিতে। আমার ছেড়ে আসা শহর। চিতলমাছের মত রূপা রঙ নদী আমি আর কোনোদিন দেখতে পাবো না!

আলতাফের আব্বা এখন মুজিব কোট পরে। অফিসঘরের দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চ উনিশ শ একাত্তরের ছবি। স্থানীয় এক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরনো নেতার মেয়েকে বিয়ে করেছে আলতাফের বড় ভাই। কেন্দ্রীয় নেতারা যখন তখন আসে। মিটিং করে। আলতাফের আব্বা জীবনজয়ের দিকে আরো এগিয়ে যায়।

আলতাফ আছে কোথাও কোনো ক্যান্টনমেন্টে। জলপাইরঙের আড়ালে। বিয়ে করেছে। দুটি মেয়ে। কেনো যেনো ওই শহরে আলতাফ কখনো যায় না।

আকরাম রেন্টু সুইজারল্যান্ডের দুই শহরে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবসে দুজন দুজনকে ফোনের ভেতর গান শোনায়। ওদের বউ বিদেশি।

দুজনেই মাঝে মাঝে ফোন করে, জানিস আমাদের বাচ্চাগুলো না বিদেশি হইছে। ফরফর করে ইংরেজিতে কথা কয়। জয়বাংলা ছাড়া শালারা আর কোনো বাংলাই শিখল না! কেমন স্বদেশছাড়া মানুষ হয়ে গেলাম রে মনা। বুকের ভেতর স্বদেশ নিয়ে প্রতিদিন বরফ ভেঙ্গে কাজে যাই। আমরা কতজন এমন স্বদেশ ছাড়া মানুষ মাতৃ ভাষা ছাড়া এখানে জমে আছি। পাকিস্থানের শাহনেওয়াজ, ভারতের উমর গুল, নরেন উথাপ্পা, মিশরের আব্দেল, প্যালেস্টাইনের আবরাব, রাশিয়ার আন্দ্রেই , বসনিয়ার হানান। আমাদের দেশ আছে কিন্তু স্বদেশ নাই রে!

আমরা যখন ছোট্ট শহরটি ছেড়ে চলে আসি, আমার সবচেয়ে ছোট বোনটি ইশকুল ব্যাগের ভেতর ওর প্রিয় গল্পের বই, "উভচর মানুষ" রাখতে রাখতে উচ্ছ্বসিত স্বপ্নে উদ্বেল হয়ে বলে ওঠেছিল, লঞ্চটা যদি আমাদের বাসা হত কি মজা হত তাই না আপুলি? আমাদের কোন ঘর থাকত না, বাগান, দোলনা, মাধুরীলতা জড়ানো গেট কিচ্ছু লাগত না। আমরা কেবল ভেসে বেড়াতাম নদীতে নদীতে, সমুদ্রে সমুদ্রে!

ও জানত না পৃথিবীতে কিছু মানুষ কেবল ভেসে বেড়ায়। কিছু মানুষ আজন্মের শরণার্থী হয়ে ঘুরে বেড়ায় এই পৃথিবীর অলি গলি, বাজার, অফিস, ফুটপাথ, বেশ্যালয়, সাততারা হোটেল, এমনকি নিজের দেশে নিজ ঘরে, নিজের মনের মনপুকুরেও!

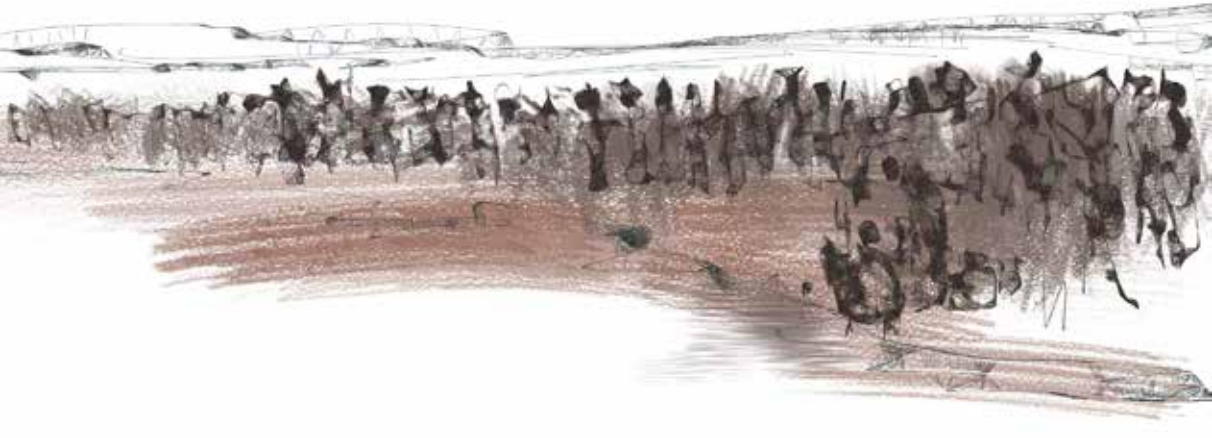

অন্ধকার কেটে যাবার পর একটি গ্রাম

কাজুও ইশিগুরো

অনুবাদ : অনন্ত মাহফুজ

এমন একটা সময় ছিল যখন আমি প্রায় প্রতি সপ্তায়ই লন্ডন ভ্রমণ করতে পারতাম এবং ভ্রমণ আমাকে শক্তি যোগাত বলে ক্লান্তিহীন থাকতাম। এখন আমার বয়স হয়েছে, তাই সহযে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। সে কারণে অন্ধকার কেটে যাবার পর গ্রামে পৌঁছে আমি কী ধরনের আজরণ করব তা বোঝে উঠতে পারলাম না। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এই একই গ্রামে কিছু দিন আগেই আমি বসবাস করেছি এবং অবার সেই প্রভাবগুলোর অনুশীলন করার জন্য গ্রামে এসেছি।

আমি কিছুই আর চিনতে পারলাম না। অপর্যাপ্ত আলোকিত রাস্তার দুই পাশের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে খেয়ে চলতে থাকলাম। রাস্তাগুলো মাঝে মাঝে অত্যন্ত সরু। গ্রামের চৌরাস্তা কাছে চলে আসা কিংবা কোনো গ্রামবাসীর সামনে পড়ার আশা করছিলাম আমি। এর কোনোটিই পাওয়া গেল না। ক্লান্তি এসে ভর করছে আমার উপর। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যে কোনো বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ব। আশা করছি যে লোকটি দরজা খুলবে, সে আমাকে চিনতে পারবে।

একটা পুরনো দরজার সামনে এসে থামলাম। দরজার চারপাশ থেকে হালকা আলো বের হয়ে আসছে। ভিতরে কথাবার্তা ও হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি জোরে কড়া নাড়লাম যাতে বাড়ির লোকজন তাদের কথা ছাপিয়ে কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পায়।। ঠিক তখন আমার পেছন থেকে কেউ একজন বলল, "হ্যালো।"

আমি ঘুরে তাকালাম। আনুমানিক বিশ বছরের একজন তরুণী অপরিচ্ছন্ন জিন্স এবং ছেড়া জাম্পার পরে অন্ধকারে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটি বলল, "আপনি একটু আগে আমাকে ছাড়িয়ে সোজা চলে আসলেন। আমি আপনাকে ডেকেছিলাম।"

"তাই? আমি দুঃখিত। আমি রূঢ় কোনো আচরণ করতে চাইনি।"

"আপনি ফ্ল্যাচার? তাই না?"

"হ্যাঁ," বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি জবাব দিলাম।

“আমাদের বাড়ি পার হবার সময় উইন্ডিও ভেবেছিল যে আপনিই যাচ্ছেন। আমরা বেশ উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। আপনি সেই অনেকের মধ্যে একজন, তাই না? ডেভিড ম্যাগিস এবং আরও অনেকে।”

আমি বললাম, “ হ্যাঁ। কিন্তু ম্যাগিস মোটেও গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিল না।” আমি অনেকগুলো নাম বললাম এবং দেখলাম যে, প্রত্যেকটি নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি মাথা দোলাচ্ছে। “কিন্তু এরা তো তোমার অনেক আগের। তুমি এসব জান দেখে অবাক হচ্ছি।”

“এসব আমাদের সময়ের আগে হলেও আমরা আপনাদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ঐ সময়ের বিষয়ে এখানকার বয়স্কদের থেকেও আমরা বেশি জানি। উইন্ডি ছবি দেখেই

আপনাকে চিনতে পেরেছে।"

"আমাদের বিষয়ে তোমাদের আগ্রহ আছে তা আমার জানা ছিল না। আমি দুঃখিত আমি হেঁটে চলে এসেছি। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, আমার বয়স বেড়েছে। এখন ভ্রমণ করার সময় বেখেয়াল হয়ে যাই।"

মেয়েটি কিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, " সেই সময়ের আপনারা সকলে ও রকমই। ডেভিড ম্যাগিস কয়েক বছর আগে এখানে এসেছিল। '৯৩ সালে, '৯৪ও হতে পারে। সে-ও এ রকম। সারাক্ষণ ভ্রমণেই থাকে।"

"তাহলে ম্যাগিস এখানে ছিল। মজার বিষয় তো। তুমি তো জান, সে আসলে গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। যাই হোক, তুমি বোধ হয় বলতে পারবে এ বাড়িতে কে থাকে।" আমি আবার দরজায় আঘাত করলাম।

"পিটারসনের পরিবার," মেয়েটি বলল। "এদের অনেক পুরনো পরিবার। এরা সকলেই আপনাকে চিনতে পারবে।"

"পিটারসন," আমিও উচ্চারণ করলাম। কিন্তু এ নাম তো আমার কাছে অর্থহীন।

"আপনি কেন আমাদের বাড়িতে যাচ্ছেন না? উইন্ডি আসলেই উত্তেজিত। আমাদের সবাই। ওই সময়ের কারও সাথে কথা বলার এটা একটা ভালো সুযোগ।"

"আমারও ওই সময়ের কথা বলতে ভালো লাগবে। কিন্ত আমার প্রথমে একটু জায়গা দরকার। তুমি বলছ, পিটারসনের পরিবার।"

আমি দরজায় বেশ জোরে আঘাত করলাম। দরজা অবশেষে খুলল। উষ্ণতা আর আলো এসে পড়ল রাস্তায়। একজন বৃদ্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে। সে আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "ফ্লেচার নয় তো? তাই কি?"

"হ্যাঁ, আমি। মাত্র গ্রামে ঢুকলাম। কয়েক দিন ধরে টানা ভ্রমণ করছি।"

সে কয়েক মুহূর্ত ভাবল এবং তারপর বলল, "ঠিক আছে, ভিতরে এস।"

ঘরটি অপরিচ্ছন্ন এবং অমসৃণ ভাঙা কাঠে ভরা। ফায়ারপ্লেসে জ্বলন্ত কাঠের টুকরাটিই একমাত্র আলোর উৎস যার মাধ্যমে ঘরের ভিতর কয়েকজন মানুষকে দেখতে পাওয়া গেল। বৃদ্ধ লোকটি আমাকে একটি চেয়ারে বসতে বলল। বসার পর মনে হলো আমি সহজে অন্যদের দেখার জন্য মাথা ঘোরাতে পারছি না। তবে ফায়ারপ্লেসের উষ্ণতা ভালো লাগল। পিছন থেকে অনেকগুলো কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, আমি ভালো কি না, দূর থেকে এসেছি কি না, ক্ষুধার্থ কি না। আমি যথাসাধ্য উত্তর দিলাম।

আমি বাড়িটি দৈবচয়ন ভিত্তিতে বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম এরা আর কেউ নয়। এ বাড়িতে থেকেই আমি এ গ্রামের অনেকগুলো বছর কাটিয়ে ছিলাম। একটা কোণার দিকে আমার চোখ গেল। ঐ কোণায় আমার বিছানা পাতা ছিল।

ওখানে বসে বহুদিন বইয়ের পাতায় চোখ রেখে কত নিঃসঙ্গ সময় পার করেছি। ঐ সময় বাড়িটি উন্মুক্ত মাঠ দ্বারা ঘেরা ছিল। উন্মুক্ত মাঠের ঘাসের উপর শুয়ে আমার বন্ধুরা কবিতা আর দর্শন নিয়ে আলোচনা করত। সে আওয়াজ ভেসে আসত আমার কাছে। অতি মূল্যবান অতীতাংশ এতটা শক্তি নিয়ে ফিরে এল যে আমি তৎক্ষণাৎ ঘরের সেই কোণার দিকে না গিয়ে পারলাম না।

কেউ একজন অন্য প্রশ্ন করল। আমার কানে কিছু ঢুকছিল না। ছায়ার ভিতর দিয়ে আমি কোণার দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার বিছানা যেখানে ছিল সেখানে আরেকটি অপ্রশস্ত বিছানা পাতা। বিছানা আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল।

আমি বললাম, "দেখ, আমি আজ অনেক দূর থেকে এসেছি। সত্যিই আমার শোয়া দরকার। কয়েক মিনিটের জন্য হলেও চোখ বোঁজা দরকার। এরপরে সবার সঙ্গে সানন্দে কথা বলব।"

দেখলাম মানুষগুলো অস্বস্তি নিয়ে সরে গেল। একজন কিছুটা কর্কষ গলায় বলল, "তাহলে শুয়ে পড়ুন। একটু ঘুমিয়ে নিন। আমাদের কথায় কিছু মনে করবেন না।"

বিছানাটা ভেজা ভেজা। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার সময় শুনতে পেলাম সেই বৃদ্ধ লোকটির কণ্ঠ, "এ ফ্লেচার। হায় ঈশ্বর, সে এতটা বুড়ো হয়ে গেছে।"

একজন মহিলা বলল, "আমরা এখন তাকে ঘুমুতে দিতে পারি না? কয়েক ঘণ্টা পর তো তার ঘুম ভাঙবে। তখন তার সাথে রাত জাগা যাবে।"

"তাহলে সে এক ঘণ্টা ঘুমাক," কেউ একজন বলল। "তার পরেও ঘুমিয়ে থাকলে আমরা তাকে ডাকব।"

এ রকম সময়ে আমার শরীর জুড়ে ক্লান্তি এসে ভর করল।

টানা বা আরামদায়ক ঘুম হলো না। ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে অনেকের কণ্ঠ কানে আসতে লাগল। এক মহিলা বলল, "আমি জানি না আমি কী করে তার মোহের ভিতর ছিলাম। এখন তো তাকে শিশুর মতো মনে হচ্ছে।"

আমি জানি না, আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল না কি ম্যাগিসকে নিয়ে। এর মধ্যে আবার ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম।

আবার জেগে উঠে দেখলাম ঘরটা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার ও ঠান্ডা। কথাবার্তা চলছে। তবে আমি কিছু আন্দাজ করতে পারলাম না। দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে রইলাম। কিছু একটা থেকে তারা বুঝতে পারল যে আমি জেগে আছি। এক মহিলা আলাপচারিতা ভেঙ্গে বলে উঠল, "দেখ, দেখ।" বুঝতে পারলাম কেউ একজন কোণার দিকে আসছে। একটা হাত আলতোভাবে আমাকে স্পর্শ করল। দেখলাম একজন মহিলা। শরীরটা পুরো ঘোরানো সম্ভব হলো না। আবছায়ার মধ্যে মহিলার মুখটা দেখা গেল।

মহিলা বলল, "ফ্লেচার, এখন আমরা কথা বলতে পারি। বহুদিন আমি তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি। তোমাকে নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবতাম।"

ভালো করে তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আবছায়ার মধ্যেও আমি লক্ষ্য করলাম, তার চোখে ঘুম ঘুম দুঃখবোধ। কিন্তু তার মুখ দেখে কোনো স্মৃতির কথা আমার মনে পড়ল না।

"আমি দুঃখিত," আমি বললাম। "আমি তোমার বিষয়ে কিছু মনে করতে পাছি না। হয়তো আমাদের দেখা হয়ে থাকতে পারে। ইদানীং কিছু মনে রাখতে পারছি না।"

"ফ্লেচার," সে বলল, "আমরা যখন পরস্পরকে চিনতাম, তখন আমি সুন্দরী যুবতী ছিলাম। আমি তোমার সব কথা আদর্শিক হিসেবে নিতাম। তুমি যা বলতে সবই যেন প্রশ্নের উত্তর ছিল। আবার ফিরে এসেছ তুমি। আমি বহু বছর ধরে একটি কথাই বলতে চেয়েছি যে, তুমি আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছ।"

"তুমি ঠিক বলছ না। হতে পারে, অনেক বিষয়ে আমারও অনেক ভুল ধারণা ছিল। ঐ সময়ে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা হলো, আমাদের সকলের বিতর্কগুলোয় আমাদের সকলের কিছু দায়িত্ব আছে। এখানের সাধারণ মানুষের চেয়ে আমরা কিছু হলেও বেশি জানতাম। আমরা যদি না জানতাম, তাহলে কে কাজ করত? কিন্তু আমি দাবি করি না যে, আমার কাছে উত্তর ছিল। না, তুমি ঠিক বলছ না।"

অস্বাভাবিক নরম গলায় সে বলল, "ফ্লেচার, আমি যখন তোমার ঘরে ঘোরাঘুরি করতাম, তুমি প্রায়ই সে সময়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করতে। এই কোণাটাতেই সুন্দর অকাজগুলো আমরা করতাম। ভাবতে অবাক লাগে একদা আমি তোমার সংস্পর্শে শারীরিকভাবে উত্তেজিত হতাম। আর এখন তুমি দুর্গন্ধময় বস্তর মতো। কিন্তু আমার দিকে তাকাও–আমি এখনো আকর্ষণীয়। মুখে কিছু দাগ পড়েছে শুধু। তবু গ্রামের রাস্তায় হাঁটার সময় শরীর দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় পোশাকই আমি পরিধান করি। এখনো অনেক লোক আমাকে প্রত্যাশা করে। আর তুমি? কোনো মহিলা আর তোমার দিকে তাকাবে না। তুমি এখন এক বস্তা বিরক্তি জাগানিয়া ময়লা বস্তু আর মাংস।"

"আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারছি না," আমি বললাম। "তাছাড়া এখন আর আমার যৌনক্রিয়া করার সময় নেই। আমার ভাববার অনেক বিষয় আছে। অনেক সিরিয়াস বিষয়। ঠিক আছে, ঐ সময়ে অনেক বিষয়ে আমার ভুল ছিল। কিন্তু আমি তো সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেছি। তুমি তো দেখছ, আমি এখন ভ্রমণের উপর আছি। আমি কখনো থেমে যাইনি। একদা যে ক্ষতি আমি করেছি তা ভ্রমণ করে করে শুধরানোর চেষ্টা করছি। এখন এসব কথা ছাড়া ঐ সময়ের অনেক কিছুই তো বলা যায়।"

মহিলা আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিল।

"তোমার নিজের দিকে তাকাও। এই কাজটি আমি করতাম, তোমার চুলে আঙুল দিয়ে

বিলি কাটতাম। আমি নিশ্চিত, তোমার ভিতর সব ধরণের বীজাণু বাসা বেঁধেছে।" কিন্তু সে আমার ময়লা জটবাঁধা চুলে বিলি কাটতে থাকল। তবে আমার মধ্যে কোনো উত্তেজনা বোধ হলো না। হয়তো সে তা চেয়েছিল। বরং তার আদর মায়ের আদরের মতো মনে হলো। হঠাৎ বিলি কাটা থামিয়ে সে আমার কপালে জোরে চড় বসিয়ে দিল।

"কেন তুমি এখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ না? তুমি তো ঘুমিয়েছ। ব্যাখ্যা দেবার মতো অনেক কিছু এখন তোমার কাছে আছে।" এই বলে সে উঠে চলে গেল।

এই প্রথম আমি ঘরটাকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। ময়লা মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে মহিলা ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা রকিং চেয়ারে গিয়ে বসল। আরও তিনজনকে নিভু নিভু ফায়ারপ্লেসের পাশে দেখা গেল। একজনকে চিনলাম। সে ঐ বৃদ্ধ যে দরজা খুলে দিয়েছিল। গাছের গুঁড়ির মতো কিছু একটাতে বসে আছে আরও দুইজন। তারা সমবয়সী মহিলা যাদের একজন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল।

বৃদ্ধ দেখল যে আমি পাশ ফিরেছি। আমি যাদের দেখছিলাম তাদেরকে সে ইঙ্গিত করল। বোঝা গেল আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন তারা আমকে নিয়েই আলোচনা করছিল। আমি দেখতে পেলাম, তারা বাড়ির বাইরে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মেয়েটি এবং তার উপর আমার প্রভাব নিয়ে কথা বলছিল।

বৃদ্ধ বলল, "তারা সকলে খুব আবেগী। মেয়েটি যে তাকে দাওয়াত দিয়েছে আমি তা শুনেছি।"

গাছের গুঁড়ির উপর বসা একজন মহিলা বলল, "কিন্তু এখন তো লোকটি খুব একটা ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদের সময়ে আমরা তাদের বশ মেনেছিলাম কারণ তারা সকলে তখন যুবক আর আকর্ষণীয় ছিল। তার মতো লোকেরা আজকাল নিজেদের অবস্থান খুব পরিবর্তন করে। তারা নিজেরাই জানে না তারা কী বিশ্বাস করে।"

বৃদ্ধ মাথা দুলিয়ে বলল, "যুবতী যেভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল তা আমি দেখেছি। ঠিক আছে, এখন না হয় সে একগাঁদা মাংসের দলা। কিন্তু যদি সে যুবকদের সামান্য প্রশংসা করে, দেখবে তারা কীভাবে তার আদর্শের কথা শুনতে চায়। তখন তাকে আর আটকানো যাবে না। ঠিক পূর্বের ঘটনাই ঘটবে। ঐ মেয়েটার মতো যুবতীদের বিশ্বাস করার কিছু নেই। এমনকি এর মতো ভিক্ষুকও তাদের ভিতর একটা উদ্দেশ্য ঢুকিয়ে দিতে পারে।"

আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় তাদের আলাপচারিতা এ রকমই ছিল। কিন্তু এখন তারা চুপচাপ। কিছু সময় পর আমি উঠে দাঁড়ালাম। চারজন আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তারা কেউ কিছু বলে কি না আমি সে অপেক্ষায় থাকলাম। অবশেষে আমি বললাম, "আমি ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা কী নিয়ে কথা বলছিলে তা আমি আন্দাজ করতে পারছি। আমি কী করতে যাচ্ছি তা নিয়ে তোমরা ভয়ে আছ। এখন আমি যুবক ছেলে-মেয়েগুলোর বাড়িতে যাচ্ছি। আমি তাদের বলব তাদের সমস্ত শক্তি, তাদের

স্বপ্ন, পৃথিবীতে টেকসই ভালো কিছু অর্জন করার আগ্রহ নিয়ে তারা কী কী করবে। তোমরা নিজেরা ঘরে বন্দী, কিছু করতে ভয় পাও। আমাকে ভয় পাও, ম্যাগিস আর ঐ সময়ের লোকগুলোকে ভয় পাও। ঘরের বাইরে গিয়ে কিছু করতে ভয় পাও কারণ তখন আমরা কিছু ভুল করে ছিলাম। তোমরা বছরের পর বছর তাদের বুঝিয়েও একেবারে নষ্ট করে দিতে পারনি। আমি এখন তাদের সঙ্গে কথা বলব। তোমরা এতদিন যে চেষ্টা করেছ, আমি আধা ঘণ্টায় তা তাদের ভিতর থেকে সরিয়ে ফেলব।"

বৃদ্ধ বলল, "দেখতে পারছ তো। আমি জানতাম এ রকমই হবে। তাকে অবশ্যই থামানো দরকার। কিন্তু আমরা কী করতে পারি?"

ঘরের ভিতর গিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে আমি রাতের রাস্তায় বের হয়ে আসলাম।

মেয়েটি তখনো বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সে আমার অপেক্ষাতেই ছিল এবং মাথা দুলিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

রাতটা স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুই পাশের বাড়ির মাঝখান দিয়ে সরু পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। আশেপাশের কিছু বাড়ি এতটাই ভাঙা যে, আমার মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত ওজন নিয়ে এগুলোর ভিতরে সজোরে ঢুকে পড়ে বাড়িগুলো ধ্বংস করে দিতে পারব।

মেয়েটি কয়েক পা সামনে ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে প্রায়ই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। একসময় সে বলল, "উইন্ডি খুব খুশি হবে। সে নিশ্চিত ছিল যে আপনিই আমাদের বাড়ি পার হয়ে যাচ্ছিলেন। আমার দেরি দেখে এতক্ষণে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেছে এ আপনিই। সে সবাইকে এতক্ষণে জড়ো করে ফেলেছে। তারা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করবে।"

"তোমরা কি ডেভিড ম্যাগিসকেও এ জাতীয় ধারণা দিয়েছ?"

"ওহ হ্যাঁ। যখন সে এসেছিল আমরা খুব উত্তেজিত বোধ করেছিলাম।"

"আমি নিশ্চিত এসবে সে উদ্বেলিত হয়েছিল। নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে তার মধ্যে একটা বাড়াবাড়ি রকমের ধারণা আছে।"

"উইন্ডি বলে ম্যাগিস মজার মানুষদের একজন কিন্তু আপনি গুরুত্বপূর্ণ। সে মনে করে, আপনি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ।"

এ নিয়ে আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম।

"তুমি তো জান," আমি বললাম, "আমি অনেক বিষয়েই আমার চিন্তার পরিবর্তন করেছি। উইন্ডি যদি আশা করে বহু বছর আগের ঐ সময়ের সমস্ত কথা আমি তাকে বলব, তাহলে আশাভঙ্গ হবে।"

মনে হলো মেয়েটি কিছু শুনছে না তবে আমাকে সে ঘরবাড়ির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কিছু সময় পর আমাদের পিছনে প্রায় ডজন খানেক লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম সাধারণ গ্রামবাসী হাঁটাহাটি করছে এবং এজন্য পিছনের দিকে তাকাইনি। কিন্তু মেয়েটি একটি ল্যাম্পোস্টের নিচে দাঁড়াল এবং পিছনের দিকে তাকাল। আমিও থেমে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালাম। ওভারকোট পরা মধ্যবয়সী একজন আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "তাহলে তুমি এখানে."

আমি তাকে চিনলাম। দশ বছর বয়সের পর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তার নাম রজার বাটন। আমাদের পরিবার কানাডা থেকে ইংল্যান্ডে আসার আগে সে কানাডায় স্কুলে আমার দুই বছরের জন্য আমার সহপাঠী ছিল। আমরা ঘনিষ্ট ছিলাম না। যেহেতু সে কিছুটা ভীতু ছিল এবং ইংল্যান্ড থেকে ওখানে গিয়েছিল, সে কিছু সময়ের জন্য আমার অনুসারী ছিল। দেখে যতটা বুঝলাম, এই সময়গুলোতে সে ভালো নেই।

আমি বললাম, "রজার, আমি এই মেয়ের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তারা একসঙ্গে হয়েছে। না হলে আমি সরাসরি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে যেতাম। আমি ভাবছিলাম এদের ওখানে কাজ শেষ হবার পরই আমি রজারের দরজায় গিয়ে টোকা দেব।"

"আমি জানি তুমি কত ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের কথা বলা দরকার। অতীত চর্বন করা। তুমি শেষ যখন আমাকে স্কুলে দেখেছিলে, আমি তখন ভিতু এক বালক। কিন্তু তুমি তো জান, আমার বয়স যখন চৌদ্দ কি পনেরো, সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি নেতার মতো হয়ে গেলাম। তুমি তো অনেক আগে কানাডা ছেড়ে এসেছ। আমি প্রায়ই ভাবি, পনেরো বছর বয়সে আমাদের দেখা হলে কেমন হতো। আমি নিশ্চিত, আমাদের দুজনের বিষয়গুলো এখন আলাদা।"

সে যখন কথা বলছিল স্মৃতিগুলো বানের পানির মতো ফিরে আসছিল। সেই সময়গুলোতে রজার আমকে আদর্শিক হতে শিখিয়েছিল। আর আমি তাকে পেটের মধ্যে কিল মারতাম বা হাতটাকে পিছনে চেপে ধরতাম। আমি এসব করতাম তাকে শক্তপোক্ত বানানো জন্য।

রজার বলে চলল, "সত্যিই তুমি ওসব না করলে, পনেরো বছর বয়সে আমার কোনো পরিবর্তনই হতো না। আমি প্রায়ই ভাবি, আরও কয়েক বছর পর আমাদের দেখা হলে কেমন হতো। "

আমরা দুই পাশের বাড়ির মাঝখানের সরু পথ ধরে হাঁটছিলাম। মেয়েটি এখনো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এখন দ্রুত পা চালাচ্ছে সে।

রজার বলল, "আমাকে বলতেই হচ্ছে, আজ তোমাকে খুব খারাপ দেখাচ্ছে। তোমার তুলনায় আমি তো একজন এথলেট। তুমি এখন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের মতো। কিন্তু তুমি জান, তুমি চলে আসার অনেক পরেও আমি তোমার আদর্শ ধারণ করেছি। আমি যা করছি ফ্লেচার কি তা করত? ভাবতাম, আমাকে তা করতে দেখলে ফ্লেচার কী ভাববে? পনেরো বছর বয়সে আমি ফিরে তাকালাম এবং তোমার ভিতর দিয়ে সব দেখলাম। তখন অবশ্যই আমি রেগে গিয়েছিলাম। এখনো আমি মাঝে মাঝে ভাবি সে বাজে একটা লোক ছিল। সেই বয়সে আমার চেয়ে তার কিছু ওজন ও পেশি বেশি ছিল। আমার থেকে সামান্য আত্মবিশ্বাস বেশি ছিল আর সে তার পুরো সুযোগ নিয়েছে। এটা পরিষ্কার ঐ সময়ে তুমি কী বাজে একটা লোক ছিলে। আমি অবশ্য এখনকার কথা বলছি না। আমরা সবাই পরিবর্তিত হই। আমি সব পরিবর্তন সানন্দে গ্রহণ করি।"

"তুমি কি এখানে অনেক দিন ধরে বাস করছ?" প্রসঙ্গ পাল্টাবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বললাম।

"সাত বছর বা এ রকম। এখানে সকলে তোমাকে নিয়ে আলোচনা করেছে। আমাদের আগের দিনগুলো সম্পর্কে তাদের বলেছি। আমি তাদের প্রায় বলতাম, কিন্তু যার কথা বলতাম সে-ই তো আমাকে মনে রাখেনি। যাই হোক, এখানকার যুবকগুলো তোমার সম্পর্কে বেশি বেশি আলোচনা করে আসছিল। যারা তোমাকে দেখেনি তারাই তোমাকে বেশি আদর্শায়িত করেছে। আমার ধারণা তুমি এসব পুঁজি করার জন্যই এসেছ। এখনো আমি তোমাকে দোষারূপ করছি না। কিছুটা আত্মসম্মান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করার সুযোগ তোমার প্রাপ্য।"

হঠাৎ টের পেলাম আমরা গ্রামের বাইরে চলে এসেছি, একটা উন্মুক্ত মাঠের সামনে। আমরা থামলাম। গ্রামের শেষ বাড়িগুলো বেশ দূরে। মেয়েটিকেও হারিয়ে ফেলেছি কারণ অনেকক্ষণ ধরে আমরা তাকে অনুসরণ করতে পারিনি। এ সময় চাঁদ উঠলে আমি দেখলাম আমরা ঘাসযুক্ত বিশাল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে।

রজার বাটন আমার দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় তার মুখ ভদ্র আর স্নেহময় দেখাচ্ছিল।

"এখনো," সে বলল, "ক্ষমা করার সময় আছে। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি তো দেখতে পারছ, কিছু নিশ্চিত জিনিস সবশেষে তোমার কাছেই ফিরে আসবে। কিন্তু যুবক বয়সে আমরা যা করি তার জন্য আমাদের দায়ী করা যায় না।"

"তুমি নিঃসন্দেহে ঠিক বলেছ," আমি বললাম।" ঘুরে অন্ধকারের দিকে তাকালাম। "কিন্তু এখনো আমি নিশ্চিত না কোথায় যেতে হবে। তুমি জান, কয়েকজন যুবক আমার জন্য তাদের বাড়িতে অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে হয়তো তারা আমার জন্য উষ্ণ আগুন আর গরম চায়ের ব্যবস্থা করেছে। আর প্রস্তুত রেখেছে কিছু বাড়িতে বানানো কেক। যে মেয়েটি আমাদের পথ দেখাচ্ছিল সে সহ সকলে আমি পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে ফেটে পড়বে। আমাকে ঘিরে তারা আনন্দ করবে। কিন্তু আমি জানি না আমি এখন কোথায় যাব।"

রজার বাটন বলল, "ভয় নেই তুমি খুব সহজে সেখানে যেতে পারবে। তুমি জান, মেয়েটা কিছুটা ভুল করেছে যে তুমি সহজে উইন্ডিদের বাড়ি চিনে সেখানে পৌঁছে যাবে। সেই বাড়ি তো বেশ দূরে। তোমাকে বাস ধরতে হবে। বেশ দূরের জার্নি। প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। তবে ভয় নেই। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব কোথা থেকে বাস ধরতে হবে।"

এই বলে সে পিছনে ফেলে আসা বাড়িগুলোর দিকে হাঁটা শুরু করল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। বুঝতে পারলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং রজারের কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন। বাড়িগুলোর আশেপাশে আবার আমরা কিছু সময় ব্যয় করলাম। তারপর সে আমাকে গ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে এল। সত্যিকার অর্থে জায়গাটা এতটা নোংরা আর ছোটো যে, এটাকে চৌরাস্তার মোড় বললে ভুল হবে। কয়েকটা মাত্র দোকান, রাত হয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকে বিপুল নীরবতা, কোথাও কোনো আওয়াজ নেই।

"ওখানে," সে বলল, "ওখানে দাঁড়ালে একটা বাস আসবে। যা বলেছি, জার্নিটা কিন্তু একেবারে ছোটো নয়। প্রায় দুই ঘণ্টা। ভয় নেই, তোমার যুবারা অপেক্ষা করবে।"

"অনেক দেরি হয়ে গেছে," আমি বললাম। "তুমি নিশ্চিত বাস আসবে?"

"অবশ্যই আসবে। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সবশেষে একটা বাস তো আসবে।" সে নিশ্চিতি প্রদান করে আমার কাঁধ স্পর্শ করল। "আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু যখনই বাস আসবে তোমার উৎসাহ আবার জেগে উঠবে। ঐ বাসটা সব সময় একটা আনন্দের উপলক্ষ। বাসটা সবসময় উৎফুল্ল মানুষে পূর্ণ থাকে, হাসিতামাশা করে জানালার দিকে তাকায়। যখন তুমি বাসে উঠবে, তুমি উষ্ণতা পাবে এবং আরাম বোধ করবে। অন্য যাত্রীগণ তোমার সঙ্গে আলাপ করবে। সম্ভবত তারা তোমাকে খেতে ও পান করতে আমন্ত্রণ জানাবে। গানও হতে পারে–তবে এটা ড্রাইভারের উপর নির্ভর করে। কিছু ড্রাইভার গানকে উৎসাহ দেয়, অন্যরা দেয় না। যাই হোক ফ্লেচার, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো হলো।"

আমরা করমর্দন করলাম। তারপর সে ঘুরে চলে গেল। দুইটি বাড়ির মাঝখানের অন্ধকারের মধ্যে আমি তাকে হারিয়ে যেতে দেখলাম।

আমি হেঁটে সবুজ জায়গাটার কাছে গিয়ে ল্যাম্পোস্টের নিচে ব্যাগ রাখলাম। দূরে কোথাও যানবাহনের শব্দের অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু রাত যেন স্থির হয়ে আছে। যাই হোক না কেন, রজার বাটনের বাসের বর্ণনা শুনে আমি চমকিত হয়েছি। এছাড়া, আমার ভ্রমণের শেষে আমাকে দেওয়া অভ্যর্থনার কথা ভাবছি–ভাবছি যুবাদের সুন্দর মুখগুলোর কথা আর আমার ভিতরে কোথাও থেকে যাওয়া আশাবাদের দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে উঠছি।

*কাজুও ইশিগুরো (জন্ম: ৮ নভেম্বর, ১৯৫৪-) নোবেলবিজয়ী জাপানী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক।

আহমদ সালেমের ঈশ্বর

সান্দর জাসবেরেইনী
বাংলা অনুবাদঃ মাজহার জীবন

হাঙ্গেরিয়ান থেকে ইংরেজি অনুবাদঃ এম হ্যান্ডারসন ইলিচ

মোবারকের পতনের পর ক্যাফেগুলো আবার চালু হলো। ভাবলাম কয়েক গ্লাস বিয়ার পান করার এখনই ভাল সময়। এতে টিয়ারগ্যাসের গন্ধও দূর হবে। একটা ক্যাব নিলাম। গন্তব্য ফালাকি স্কয়ারের কর্নিশ এর শেষ প্রান্তে হুরিয়া ক্যাফে।

ক্যাবের খোলা উইন্ডো দিয়ে বাতাস ঢুকে আমার শার্ট এলোমেলো করে দিচ্ছে। মরুর তীক্ষ্ণভেদী রোদে নীল নদকে লালচে দেখাচ্ছে। নৌকাগুলো পানিতে বেশ দোল খাচ্ছে–শব্দ ভেসে আসছে। ওগুলোর বাতি নেভানো।

দু'রাস্তার মাঝে ধুসর রঙের আব্রাহাম ট্যাঙ্ক বসানো। ফলে কিছুটা ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে। ট্যাঙ্কের ব্যারেল সিটি সেন্টারের দিকে তাক করা। বন্দুক রাখার উঁচু জায়গায় গোঁফওয়ালা এক সৈনিক অলস সময় পার করছে। জোর করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানো এক তরুণ সৈনিক আমাদের লেনের কাগজপত্র পরীক্ষা করছিল। গাড়ির খোলা জানালায় ঝুঁকে দেখার সময় একে-৪৭ রাইফেলটা তার কাঁধের সাথে লেগে ঠনঠন শব্দ হলো। ওর ঘামে ভেজা বাদামী রঙের শরীরে অবসাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

– 'শুভ সন্ধ্যা' বলে সৈনিকটি আমার পাসপোর্টের দিকে এক পলক নজর দিল। আমাদের চলে যাবার জন্য ইশারা করলো সৈনিকটি। আমি ড্রাইভারের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

– 'একেই বলে স্বাধীনতা'– ড্রাইভার স্মীতহেসে বলল। ক্যাবে বিদেশিদের উপর

পুলিশের নজরদারীর বিষয়ে সে আগে থেকেই অভ্যস্থ।

– এখনই আমাদের উল্লাস করার সময় হয়নি।

তাহরির স্কয়ারের দিকের হাইওয়ে ধরে আমরা সামনে এগুতে থাকলাম। এ এলাকাটা মিলিটারির নিয়ন্ত্রিত। সাদ জগলুলে গাড়ি থেকে নেমে আমি একটু হাঁটলাম। রাস্তায় মানুষের চলাচল নাই বললেই চলে। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো আমার স্যান্ডেলের তলায় পড়ে গুড়ো হয়ে যাচ্ছে। ব্যারিকেড হিসেবে ব্যবহার করা পরিত্যক্ত ক্যান থেকে এখনো ধিকিধিকি করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সিটি সেন্টারে এ সময়ে হাঁটার মজাই আলাদা, যেখানে আমাকে মেরে ফেলার জন্যে কেউ নেই। পুরো বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ আমি কভার করেছি। তখন মলোটভ ককটেলের বিস্ফোরণ কিম্বা মেশিনগান ফায়ারের শব্দ না বরং টিয়ারগ্যাসে অভ্যস্থ হতেই কিছুদিন সময় লেগেছিল। আর অন্যদিকে, স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে নতুন জীবনযাপনেও অভ্যস্থ হয়ে পড়ছিলাম। প্রথমে মদ ছাড়তে হয়েছিল, তারপর ধূমপান। পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকলে গরম পানিতে গোসল এমনকি আরো পরে বিছানাপত্তরও ছাড়তে হলো। গলা কাটার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ানো রক্তপিপাসু উত্তেজিত জনতার রোষ থেকে নিজেকে বাঁচাতে তরিতরকারির দোকানে ইঁদুরের সাথে আলুর বস্তায় শুয়েও গভীর নিদ্রা যাওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলো আমার কাছে!

বিলেদ। ক্যাফের হেড ওয়েটার কপটিক খ্রিস্টান। মদ্যপ। হুরেইয়া বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে ও। আমি সিগারেটে একটা লম্বা সুখটান দিয়ে মুখাটা স্যান্ডেলে পিষে রাস্তায় কিক করলাম।

– 'আমি তো ভেবেছিলাম আপনাকে এতদিনে আটক করা হয়েছে।' ও আমাকে দেখে হেসে বলল।

– তিনবার ওরা আমাকে আটক করেছিল।

– তো এখানে কীভাবে এলেন?

– ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

– তাহলে তো এটা ভিন্ন কাহিনি! ভেতরে গিয়ে পেছনের দিকে একটা সিট নিয়ে বসুন।

হ্যান্ডশেক করে আমি ক্যাফের পেছনে চলে গেলাম। পেছন দিকটা বেষ্টনী দিয়ে আলাদা করা। যারা বিয়ার খায় তারা জানালার ধারে বসুক এটা বিলেদ পছন্দ করে না, যাতে ক্যাফের বাইরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা চটে না যায়। যদি পেছনে জায়গা ভরে না যায় কিংবা যদি সে নিজে কাউকে তোয়াক্কা না করার মতো ড্রিঙ্ক না করে তাহলে সবাইকে সে পেছনে পাঠায়। আমি একটা সিটে গিয়ে বসলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে সে একটা মিশরীয় 'স্টেলা' আমার সামনে এনে রাখলো। বিয়ারটি ঠাণ্ডা। এর ফেনা কানায় কানায় ভরে হালকা একটা ধারা বোতল থেকে চুইয়ে পড়লো। আঙুল ভিজে গেল আমার। ঠোঁটে নিয়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দিলাম। ওটা গলা দিয়ে নামতেই বুদবুদ তরলের স্বাদ উপভোগ করতে লাগলাম। চোলাই করা গোলাপের গন্ধ আমার নাকে আসতে লাগলো। নিজেকে এক নতুন মানুষ মনে হতে থাকল।

বিয়ার শেষ হলে, পরিচিত কাউকে পাই কি-না তার জন্য ক্যাফের এদিক ওদিক খেয়াল করতে লাগলাম। একা একা পান করতে মজাই লাগে না। কোন বিদেশি পাবো তেমন আশা নেই কারণ গণ্ডগোলের শুরুতেই অধিকাংশ দেশত্যাগ করেছে। আর পশ্চিমা জার্নালিস্টের বেশিরভাগ হিলটন রামসে বা এসটোরিলের মতো অভিজাত স্থানে পানাহার করে। ওসব জায়গায় বিদেশি বিয়ার পাওয়া যায়। কিছু গে ছেলে প্লাস্টিক টেবিলক্লথ দেয়া ফ্লাইসিট টেবিলে বসে আছে। ছোট চুলের কিছু সুদানি যৌনকর্মী কাস্টমারের জন্য আশপাশে অপেক্ষা করছে। আরেকটা বিয়ার দেয়ার জন্য আমি বিলেদকে ডাক দিলাম। কেউ বারে আজকের আল আহরম এর একটা ইস্যু ফেলে রেখে গেছে। হেডলাইনে বিপ্লবে নিবেদিতদের জন্যে স্তুতি, শহীদদের হাতে আঁকা মিনিয়েচার ছবি। লাল হেডলাইনে বড় করে লেখা: গত তিন সপ্তাহে ৮৪০ মৃত্যু; সাথে সাব হেড: আহত ৬০০০ এর অধিক।

সামনে তাকাতে এক নতুন কাস্টমারকে ঢুকতে দেখলাম। বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার টেবিলের কাছেই বসলো। তাঁর গায়ে সাদা গালাবিয়া। মাথায় হাজি টুপি। সুন্নি মতে দাঁড়ি রং করা ও ছাঁটা। দিনে পাঁচবার নামাজ আদায়ের কারণে পাটিতে ঘষা লেগে তাঁর কপালে কালো দাগ হয়ে গেছে।

– 'আপনার জন্য কি আনাবো ডাক্তার?' বিলেদ জানতে চাইলো।

– একটা স্টেলা।

হেডওয়েটার একটা বিয়ার এনে লোকটার সামনে রাখলো। লোকটা মুহূর্তে তা সাবাড় করে ফেললো।

–আরেকটা!

–আপনার ইচ্ছে, ডাক্তার।

আমি বোবা হয়ে বসে রইলাম। কায়রোতে আপনি খুব কম মুসলিমই দেখবেন, যে মদ খায়। বিলেদ অবাক করে আমার টেবিলে এগিয়ে আসলো। আমার কানে ফিসফিস করে বললো, 'আপনি আহমেদ সালেমকে নিয়ে ভাববেন না। পরে আপনাকে পুরা ব্যাপার বুঝিয়ে বলবো।'

আমি বিয়ার পানে মনোযোগ দিলাম। পত্রিকার আরো কিছু খবর পড়লাম। ইসলামিস্ট ভদ্রলোকটি ম্যাকানিক্যালি বিয়ার গিলতেই থাকে। দেখলাম, আধাঘন্টারও কম সময়ে স্টেলার সাতটা খালি বোতল তার সামনে পড়ে আছে। বিয়ার পানের কারণে একাগ্রতার সাথে পত্রিকার দিকে মনোযোগী হই। মিলিটারি আর জনতার সৌহার্দ্য, আসন্ন গণতান্ত্রিক সংস্কার আর নতুন নায়কদের বিজয় উৎযাপনের খবর পড়ে মজা লাগলো। এর মধ্যে খেয়াল করলাম আমার টেবিলের পাশেই কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ও একজন সুদানি গণিকা। তার পরনে ফুলের এমব্রডারি করা পোশাক। কোমরে এক হাত রেখে সে নিখুঁত এক পাটি সাদা দাঁত বের করে হাসছে।

– 'আমি জানি আপনি এখানে কেন এসেছেন'। এরপর ঠোঁট কামড়ে বললো, 'আমাকে একটা বিয়ার একটা বিয়ার কিনে দেবেন?'

তাকে কাছে টানতে আমি তার জন্যে বিয়ারের গ্লাস এগিয়ে দিলাম। পোশাকের ভেতর

থেকে তার নিপল দুটো উঁকি দিচ্ছে। সম্ভবত এখানে আসার আগে এ রকম শেইপ করে এনেছে। চমৎকার শরীর। যুবতী। শক্ত সামর্থ্য। ওর নগ্ন দেহের ইমেজ আমার মাথায় চক্কর দিলো: বাদামী স্তন, আর পুরোপুরি কালো নিপল। যদিও আমার মাথায় এখনো সে চিন্তা নাই। আমি গত কয়েক সপ্তাহে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি। এ মুহূর্তে এর সাহচার্য নেবার মতো সামর্থ্য নাই। ফলে ওর হাসি নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ওয়াশরুমের দিকে উঠে যাবার আগে তার কণ্ঠে আমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেল। ইসলামিস্ট লোকটি সবে তার নবম বোতল বিয়ার শেষ করলেন। মেয়েটি তার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলে তিনি তাকে হাত দিয়ে থামালেন। ফিসফিস করে কি যেন বললেন, শুনতে পেলাম না। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গোলাবিয়ার পকেটে হাত ঢুকালেন। ১০০ পাউন্ডের একটা নোট বের করে টেবিলে রাখলেন। মেয়েটি বৃদ্ধ লোকটির হাত ধরে প্রস্থান-দরজার দিকে এগুতে থাকল। দু'জনে মিলে বিস্ময়কর আর অবর্ণনীয় এক জুটি!

–বিদায়, ডাক্তার। রাতের আঁধারে তারা মিলিয়ে যাবার আগে বিলেদ বলল।

চলে যাওয়ার সময় আমি তাদের চেহারা দেখছিলাম।

কারফিউয়ের সময় হয়ে আসছে। বেশিরভাগ কাস্টমার এতোক্ষণে চলে গেছে। শুধু আমরা দু'জন রয়ে গেছি। রাতে কেবল বাতাসে সিলিং ফ্যান ঘোরা আর ফ্রিজের গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। একটা ছেঁড়া জীর্ণ কাপড় দিয়ে বিলেদ একটা পোকা মারার চেষ্টা করলো। তারপর এক গ্লাস গিলে আমার পাশে বসলো। আমার বিয়ার জোগাড়ে সাহায্য করলো।

– 'বিপ্লব একেক জনের জীবনে বিচিত্র কিছু অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে এসেছে'। বিলেদ বললো। 'যে মানুষটিকে আপনি একটু আগে দেখলেন, উনি ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছেন।

বিলেদের চেহারায় দুঃখ কিংবা উল্লাস কোনটাই ফুটে উঠলো না। সে কেবল সাধারণভাবে ঘটনাটা বললো। আবার চুমুক দেয়ায় ওর গ্লাসের প্রান্তে লেগে থাকা ময়লা বিয়ার দিয়ে ধুয়ে গেল।

– 'উনি কি আপনার বন্ধু?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

– উনার নাম আহমেদ সালেম।

– উনি কি মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য?

– না উনি কোন রাজনীতির সাথে যুক্ত নন।

– ব্রাদারহুডের মতো উনি তো হাজি পোশাক পরেছেন!

– আমার ধারণা উনি পরিবর্তন করার সময় পাননি। এমনও হতে পারে উনার আর কোন পোশাকও নেই।

বিলেদ আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিল। ঠোঁটে ধরে পকেটে লাইটার খোঁজা শুরু করলো। না পেয়ে টেবিল থেকে আমার গ্যাস লাইটারটা নিয়ে ও সিগারেটটা ধরালো।

– 'আপনি তাকে কতটুকু চেনেন?' আমিও একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলাম।

– খাজর এল এইনি স্ট্রিটে আমার প্রতিবেশি উনি। একজন ডাক্তার। এটা সেটা প্রয়োজনে আমি তার কাছে যাই।

– উনি ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছেন তা কীভাবে বুঝলেন?

– আমাকে বিয়ার খাওয়ান। বলছি।

কাস্টমারের কাছে টো টো করে ঘুরে ঘুরে ড্রিঙ্কস, সিগারেট নিয়ে খাওয়ার ভয়ানকরকম বাজে অভ্যেস বিলেদের। এমনকি কখনো কখনো কেবল তাদের পাশে গিয়ে বসাও তার অভ্যেস। সে হেডওয়েটার হওয়ায় আমার মতো কাস্টমারের পক্ষে তা জীবন-মৃত্যুর মতো ব্যাপার, তাই তাকে না করার প্রশ্নই উঠে না। সম্মতি দিলাম। সে উঠে দাঁড়ালো। ফ্রিজ থেকে দুটো বিয়ার নিয়ে ফিরে টেবিলে রাখলো।

– ঘটনাটা এরকম। সালেম খুবই ধার্মিক আর একজন ভাল মুসলিম। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি নিজেকে ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ সপে করেছিলেন।

বিলেদ তার সামনে থাকা ড্রিঙ্ক অনেকখানি সাবাড় করে ফেললো।

– 'আমি সব সময় হিংসা করার মতো আশাবাদী মানুষ।' শুষ্ক গলায় বললাম।

– আমিও। কোন কারণে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তিনি তার বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। যেমন ধরুন, তার চাকুরিতে তিনি বড় পজিশন পাবেন না কারণ হাসপাতালের প্রধান নিশ্চিতভাবে মনে করতেন তার ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্ক আছে। সন্তান প্রসবের সময় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর একাই তিনি তার একমাত্র কন্যাকে লালন-পালন করেছেন। তারপরও তার কোন সময় ঈশ্বরের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কমতি হয়নি। তিনি প্রত্যেকটা ভিক্ষুকের নাম জানেন। কোনদিন কোন গরীবের কাছ থেকে তিনি টাকা নেননি। এমনই মানুষ তিনি। এ ধরনের মানুষ বিরল। কিন্তু এখনো আছে।

– আর?

– যখন মিলিটারিরা জীবন নিয়ে খেলা শুরু করলো, তিনি তখন ভাবলেন তাঁর ডাক্তার হিসেবে নেয়া শপথ তাকে রক্ষা করতে হবে। হাসপাতালে তারা আহত বিক্ষোভকারীদের আটক করছিল।

– আমিও এমনটি শুনেছি।

– এ রকমই ঘটেছে। মুকাবারাদরা অপারেশন টেবিল থেকে বিক্ষোভকারীদের তুলে নিয়ে গেছে।

– এর সাথে তার ঈশ্বর পরিত্যাগের সম্পর্ক কি?

– এক সময় সালেমের কাছে পরিস্কার হয়ে গেল বিক্ষোভকারীরা আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থেকে মরবে তবুও তারা হাসপাতালে যাবে না। তখন তিনি আর কিছু ডাক্তার ও

নার্স মিলে আবু বকর মসজিদের এক রুমে আহতদের জন্য এক সেবাকেন্দ্র খুলেন।

– সেটা এক কর্নারে স্থাপন করা হয়েছিল। ছবি তোলার জন্য আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তারা নামাজের পাটির উপর এটা করতো।

– ওর উপর তারা ঘুমাতোও।

বিলেদ উঠে দাঁড়ালো। ক্যাফের দরজা বন্ধ করলো। টেবিলের উপর চেয়ারগুলো রাখা শুরু করলো। প্লাস্টিকের টেবিলক্লথের সাথে চেয়ারের ঘষায় টেবিলের পায়াতে জটলা করে বসে থাকা পোকা উড়তে শুরু করে।

– তারা দিনে ছয় শ রোগী দেখতো।

– আপনি তা কীভাবে জানলেন?

সে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। তার পা থেকে প্যান্ট উপরের দিকে তুললো। গোড়ালি ফোলা ও রক্তবর্ণ। একটা লম্বা কালো কাটা দাগ তার হাঁটু পর্যন্ত ছড়ানো।

– পা ভেঙ্গে যায় নি কিন্তু আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। সে এখনকার চেয়ে দেখতে তখন কদাকার ছিল। তারা আমাকে হাড়ভাঙ্গা আর পোড়া রোগীদের পাশে রেখেছিল। তখন ডাক্তাররা দিনে একুশ ঘন্টা করে সেবা দিত। সালেম তার সর্বোচ্চ দিয়ে সেবা দিত। শুধু নামাজের সময়টুকুতে বিরতি নিত। তারা যেখানে নামাজ আদায় করতো সেই কর্নারে লাশগুলো গাদা দেয়া থাকতো। তারপরও নামাজ আদায় তারা বন্ধ করেনি।

- তিনি নিশ্চিত সত্যিকার ধার্মিক

– তা তো বটেই। তবে রোগীরা তাকে দেখে ভয় পেত।

– তিনি লাশের পাশে নামাজ আদায় করতেন তাই?

– না। অন্য কারণে। একজন সার্জন হিসেবে তিনি কেবল খুব সিরিয়াস রোগীদের নিতেন। কোন ওষুধ নাই, কোন যন্ত্রপাতি নাই। যেন মধ্যযুগ। তাদেরকে এ অবস্থার মধ্যেই সেবা দিতে হত। তার হাতে প্রায় ষাটজন রোগী মারা গেছে। এমন পরিস্থিতি দাঁড়ালো যেন তিনি যাকে সেবা দিবেন সেই রোগীই মারা যাবে।

– এ কারণেই তিনি ড্রিঙ্ক করা শুরু করেন?

– সেটা একটা কারণ বটে, অন্য কারণও আছে। আহতরা তার কাছ থেকে দূরে থাকতে কান্নাকাটি করতো। কেউ কেউ হ্যালুসিনিয়েশনে ভুগতো। ঈশ্বরের কাছে তারা মোনাজাত করতো যাতে তাদের আজরাইল স্পর্শ না করতে পারে। আমার ধারণা এতে তিনি মনে আঘাত পেয়েছিলেন। কারণ এ ধরনের ঘটনায় মানুষের মনে আঘাত পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার ঈশ্বর পরিত্যাগের এটাও কারণ না।

– তাহলে?

– তখন বিপ্লবের চতুর্থ দিন। পুলিশ তালাত হারবনে জনতার উপর গুলি চালাল। বিক্ষোভকারীরা আহতদের কম্বলে পেঁচিয়ে আনতো। এতো দিনে এসব সালেমের কাছে রুটিনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি রোগীদের সুশৃঙ্খলভাবে লাইন দিয়ে

রাখছিলেন। আর যাদের তিনি বাঁচাতে পারবেন কেবল তাদেরই সেবা দিচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন আহতদের মাঝে তার মেয়েকেও তিনি দেখতে পেলেন।

– ও কি তাহরিরে বিক্ষোভ করছিল?

– অবশ্যই না। সে বাড়ি ফিরছিল। আকস্মিক এক বুলেট তার গায়ে লাগে। ফুসফুস ফুটো করে দেয়। তাকে যখন আনা হয় তার আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি মেয়ের ক্ষতস্থান আঙুল দিয়ে চেপে ধরছিলেন যাতে রক্ত বন্ধ হয়। এরপর তিনি অপারেশন শুরু করেন। এরই মধ্যে সবাই শুনতে পেল তিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলছেন। তিনি বলছেন, 'শুধু একে তুমি নিও না। আমি নিরাপরাধ। তোমার সবকিছু মেনে চলেছি। কোনদিন কোনকিছু চাইনি। তোমার কাছে শুধু এ ভিক্ষাটুকু চাই।'

– 'তারপর কি হল?' আরো দুটো বিয়ার ফ্রিজ থেকে আনার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। বিলেদ আরেকটা সিগারেট ধরালো এবং বসে পড়ে চেয়ারে হেলান দিল।

– তিনি তার মেয়েকে বাঁচাতে পারলেন না। মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। আর সে কারণেই তিনি ড্রিঙ্ক করা শুরু করেন। তিনি ঈশ্বরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলেন।

আমি বিল পরিশোধের জন্য হিসেবের জন্যে বোতলগুলো টেবিলের উপর রাখলাম।

– অথবা তিনি বুঝেছেন ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নাই, বিলেদ বলে যায়। কথা বলতে বলতে সে কিছু সিগারেটের ধোঁয়া উপরে ঠেলে দিল আর আমাদের বিয়ারের বোতলের মুখগুলো খুলতে শুরু করলো।

সে রাতে আরো দশ বোতল বিয়ার আমাদের পানের সাথে যোগ হলো।

*লেখক সান্দর জাসবেরেইনীর জন্ম ১৯৮০ সালে হাঙ্গেরির সপরোনে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সংঘাতপূর্ণ এলাকার সংবাদদাতা হিসেবে পরিচিত।

মীনা কুমারী নাম - নিঃসঙ্গ আকাশে একা চাঁদ

জাভেদ হুসেন

বোম্বের 'পাকিযা' ছবির কথা মনে আছে আপনাদের? সামনে খোলা জায়গা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে উঁচুতে গানের আসর বসেছে। নায়িকা সামনের দিকে আঙুলে ইশারা করে গান শুরু করলেন "ঠারে রহিও ও বাকেঁ য়ার রে"। একটু দাঁড়াও ও আমার বাঁকা শ্যাম। কাকে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে? আসরের সবাই ঈর্ষায় ঘুরে তাকালেন। দেখা গেল আকাশে হাঁসছে বাঁকা চাঁদ।

ইনি মীনা কুমারী। জন্মেছেন মাহযাবিন বানো নামে। আলী বখশ আর ইকবাল বেগমের ঘরে। ১৯৩৩ সালে। বাবা মা দুজনই পারশি থিয়েটারের শিল্পী। বাবা হারমোনিয়াম বাজান, গান শেখান আর উর্দু কবিতা লেখেন। সিনেমাতে ছোট চরিত্রে অভিনয়ও করেন, গানে সুর দেন। কিন্তু সংসার চলে না। তৃতীয় কন্যা মাহযাবিনের জন্মের পর ডাক্তারের ফি দেয়ার পয়সা ছিল না। ঝামেলা এড়াতে সদ্যজাত মেয়েকে এতিমখানায় দিয়ে এলেন।

মাহযাবিনের কোন শৈশব ছিল না। বাবা এতিমখানা থেকে নিয়ে এলেন। কিন্তু স্কুল যাওয়া হলো না। এ নিয়ে সারা জীবন দুঃখ ছিল। ৪ বছর বয়সে সিনেমায় অভিনয় করা শুরু করতে হলো বাবা মার চাপে। নাম হলো বেবি মীনা। সেই তখন পরিবারের উপার্জন করা সদস্য। ১৩ বছর বয়সে প্রথম নায়িকা হিসেবে কাজ শুরু করেন।

২১ বছর বয়সে অভিনয় করেন কাল্ট ফিল্ম 'ব্যায়জু বাওরা'তে। ফিল্ম ফেয়ার এওয়ার্ড পান। ১৯৬৩ সালে সবগুলো শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মনোনয়ন পান তিনি।

১৯৫২ সালে পরিচয় ঘটলো আরেক প্রতিভা কামাল আমরোহির সাথে। 'মুঘলে আযম'

ছবির পরিচালক। দুজনের প্রেম হলো। মাহযাবিন লিখলেন:
আগায তো হোতা হ্যায় আনযাম নেহিঁ হোতা
জাব মেরি কাহানি মেঁ ও নাম নেহিঁ হোতা
(শুরু যদিও হয়, শেষ তো হয় না
যদি আমার গল্পে না আসে সেই নাম)

কামাল তাঁকে 'আনারকলি' ছবিতে অভিনয়ের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু এর মধ্যে তিনি গাড়ী দূর্ঘটনায় বাঁ হাতের কড়ে আঙুল হারালেন। এরপর থেকে সব ছবিতে সেই আঙুল আড়াল করে শুটিং হয়েছে। ১৯৫২ সালে দুজন বিয়ে করলেন গোপনে। মেয়ের বাবা নারাজি, ওদিকে কামালের আছে স্ত্রী, তিন সন্তান।
কামালের সঙ্গে বিয়ে স্বস্তি আনলো না। সৈয়দ বংশের নয় বলে মীনার সঙ্গে কোন সন্তান নিতে তিনি রাজি হলেন না। দুই জন একে অপরের কাছে ক্রমেই অবোধ্য হয়ে উঠতে লাগলেন। মীনাজির উপলব্ধি হলো:
হামসফর কোয়ি মিলে ভি তো কাহিঁ
দোনো চলতে রহে তানহা তানহা
(কোথাও যদি কোন সঙ্গী মিলেও যায়
দুজনেই চলেছি একই পথে একা একা)
দিল তোড় দিয়া উস নে য়ে ক্যাহ কে নিগাহোঁ সে
পাত্থার সে টকড়ায়ে ও জাম নেহিঁ হোতা
(দৃষ্টির ভাষায় হৃদয় ভাঙল সে এই কথা বলে
পাথরে ঠোকর খাওয়া কাঁচের পানপাত্রের কাজ নয়)

অথচ কামাল আমরোহির কাছে তাঁর চাওয়া ছিল খুব স্পষ্ট আর সরল:
যিন্দেগি ইক বেরংগ কাতরা হ্যায়
তুমহারে দামন কি পানাহ পাতে তো আঁসু হো জাতা
(জীবন এক রঙহীন একবিন্দু জল
তোমার আঁচলের আশ্রয় পেলে সে অশ্রু হয়ে যেত)

১৯৬০ সালে আলাদা হয়ে ১৯৬৪ তে পাকাপাকি আইনি বিচ্ছেদ হলো। মাহযাবিন বানো এবার মীনা কুমারী নায হয়ে মদিরাতে আশ্রয় খুঁজলেন। সঙ্গে জন্ম নিলো কবিতা। প্রবাদপ্রতীম সুরকার নওশাদ বলেছেন "মীনা তাঁর জীবনে সব সময় কারো না কারো স্বার্থে কাজে লেগেছেন। এই বেদনা আর হতাশাবোধ থেকে আশ্রয় নিয়েছেন মদ আর কবিতার"। কিন্তু কবিদের জগতও তাঁকে অস্বীকার করলো ফিল্মের নাচনেওয়ালি বলে। বিখ্যাত কবি ফিরাক গোরাখপুরি মুশায়রায় মীনা কুমারীর উপস্থিতিতে কবিতা পড়তে অস্বীকার করলেন– এ কি বাইজির নাচের আসর?
উর্দু কাব্য ঐতিহ্য বরাবরই মানুষকে সীমিত করে ফেলার কাঠামো আর পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মীনা কুমারী নায সেই ঐতিহ্যে যোগ দিলেন। পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরে এসে দেখলেন কত সহজে তাঁর বাইরের জনপ্রিয়

খোলস 'নায়িকা'র মৃত্যু হতে পারে। তিনি তা মেনেও নিয়েছেন:
আয়াদত হোতি জাতি হ্যায় ইবাদত হোতি জাতি হ্যায়
মেরে মরনে কি দেখো সব কো আদত হোতি জাতি হ্যায়
(খবর নিতে আসার ছলে তোমাদের পূণ্য হয়ে যায়
দেখো, আমার মৃত্যুতে সবার কেমন অভ্যাস হয়ে যায়)

নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করবার মাঝ দিয়ে যখন নিজের থাকবার প্রমাণ খুঁজতে হয়, সে বড় নির্মম মুহূর্ত! মির্জা গালিব এমন প্রসঙ্গে বলেছিলেন:
দোস্ত মেরি গমখোয়ারি মেঁ সয়ি ফরমাওয়েঙ্গে কেয়া
যখম কে ভরনে তলক নাখুন না বাঢ় আওয়েঙ্গে কেয়া
(বন্ধুরা আমার দুঃখনিদানে কি সঙ্গ দেবে?
জখম সারার আগেই কি নখ আবার বড় হয়ে যাবে না?)

নায লিখলেন:
খুদ হি কো তেয নাখুনোঁ সে হায় নোচতে হ্যাঁয় আব
হামেঁ আল্লাহ খুদ সে ক্যায়সি উলফত হোতি জাতি হ্যাঁয়
(তীক্ষ্ণ নখে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করি আজকাল
ঈশ্বর! নিজেকে এ কেমন ভালবাসতে শুরু করেছি আমি)

তিনি কবিতা লিখেছেন ১৯৬০ এর দশকে। প্রগতিশীল কবিদের ধারায় তিনিও গজলের প্রথা মেনে লিখতে চাননি। তাঁর কবিতা সরাসরি, মনের কথা বোঝাতে কোন জটিলতা তিনি পছন্দ করতেন না। অলংকারহীন, সরল সেই কবিতা তাঁর তারকা জীবন থেকে বের হয়ে আসার অভিযান। এই তারকা জীবন মীনা কুমারীর জীবনকে গিলে খাচ্ছিল। যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি অনিচ্ছায় এসেছিলেন স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছে বাদ দিয়ে, কবিতা ছিলো সেই ইন্ডাস্ট্রির দেয়া পাবলিক ইমেজ হতে তাঁর দূরে যাওয়ার বাসনার প্রকাশ। নিবিড় পাঠে সেই কবিতা যতটা তাঁর, তারচে' বেশি সেই বিনোদন কারখানার অন্তরালে মানুষের জীবনের মৃত্যুর কথা বলে।
একটা মাত্র কবিতার বই তাঁর। বের হয়েছে মৃত্যুর পর। ঘনিষ্ঠজন গুলজারের উদ্যোগে। গোটা পঞ্চাশেক কবিতা। এ হলো পপুলার কালচার ইন্ডাস্ট্রি আর এর সকল অসুখের বিরুদ্ধে একজন মানুষের বিদ্রোহ। কবি নিজের পাবলিক ইমেজকেই চ্যালেঞ্জ করছেন। মেলে ধরছেন নিজের ভেতরের বহুস্তরের ব্যক্তিত্ব। সেই মানুষের জন্মই হয়েছে এই সংস্কৃতির মধ্যেই।
তাঁর অভিনয় করা 'সাহেব বিবি অওর গুলাম' ছবির চরিত্রের মতই মীনাজির সৌন্দর্য ছিল নিজেকেই ধ্বংস করতে উন্মুখ। এমন সংবেদনশীলতা আর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিছক ট্রাজেডি কুইনের ফিল্মি ইমেজ তাঁর কাছে স্বস্তিদায়ক ছিলো না। একটা কবিতা লিখেছিলেন 'কালের বিপণী' নামে। সেখানে দেখিয়েছেন সম্পদের মোমের পুতুলের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে মানুষের সত্তা কেমন সামান্য স্পর্শে গলে পড়ে। নায সেখানে বলছেন যে এই বেণিয়া সাফল্য মানুষের চাওয়া প্রশান্তির বিকল্প হতে পারে

না:
একটা সুন্দর ভালবাসার স্বপ্ন
আমার আগুন চোখে ঢালবে যে শান্তি বারি
নিখুঁত কাছে পাওয়ার একটি মুহূর্ত মাত্র
আমার অস্থির প্রাণে যে দেবে দু'দণ্ড শান্তি
আমি তো এর বেশি চাইনি কিছু আর
আর দেখো এই কালের দোকানে
এসবের কিছুই রাখা নেই

নিজের সময়কে সবচেয়ে নগ্নভাবে দেখেছেন তিনি। মানুষ কেমন করে এই কালের কাঠামোতে সাফল্যের জন্য নিজের সত্তাকেই জ্বালানী হিসেবে সঁপে দেয় দেখেছেন। দেখেছেন কেমন করে এই সময় মানুষকে যে আশা দেয়,
সে আশা আসলে তার ধোঁয়াহীন চিতা হয়ে ওঠে:
যামানা জ্যায়সে ফাকাযাদাহ গিরোহ গিদ্ধরোঁ কা
বেকাফন উম্মিদোঁ পে পেহরা দেতা হ্যাঁয়
(কাল যেন উপোষী শকুনের দল
কাফনহীন আশার লাশ পাহারা দেয়)

সিনেমার নায়িকা হয়ে মীনা কুমারী তাঁর প্রেমিকের জন্য শর্তহীন আনুগত্য দেখিয়েছেন। কবিতায় তিনি সম্পুর্ণ বিপরীত। মানবিক সম্পর্ক তো বটেই, এমনকি মানুষের বিমূর্ত বর্তমান আর অতীত কালকে ছকের মধ্যে দেখতে তিনি একেবারে নারাজ। 'কাল ও আজ' নামের এক কবিতায় তিনি বলছেন:
প্রতিটি সুখ এক তীব্র বেদনা
প্রতিটি বেদনা এক সর্বনাশা সুখ
এই চেনা অন্ধকার
এক ধর্ষিত আলো
ধর্ষিত আলো একেকটি অন্ধকার
তেমনই
এই সব বর্তমান
নিভে যাওয়া অতীত
আর সব অতীত
নিশ্চিহ্ন বর্তমান

নিজের সবটুকু দিয়ে অজস্র জনতার কিছু ভালো সময় কাটানোর নিমিত্ত মাত্র হতে মীনাজির আপত্তি ছিল। মানুষ তাঁর অভিনয়ে তাঁকে 'ট্রাজেডি কুইন' উপাধি দিয়েছিল। তাঁর কাছে তা নামমাত্র ছিলো না। নিজের জীবনে আরো বড় ট্রাজেডি সওয়ার সাহস তার ছিলো। নিজের ভেতরে যে নিঃসঙ্গ চলচ্চিত্রের জন্ম হচ্ছিলো সে নিয়ে তিনি খুব স্পষ্ট ধারনা রাখতেন:

আবলা পা কোয়ি ইস দশত মেঁ আয়া হোগা
ওয়ারনা আঁধি মেঁ দিয়া কিস নে জালায়া হোগা
(পথ চলে বিক্ষত পায়ে কেউ এসেছে হয়তো
নইলে এমন ঝড়ে প্রদীপ জ্বালাবে কে?)
খুন কে ছিঁটে কাহিঁ পুছ না লেঁ রাহোঁ সে
কিস নে বিরানে কো গুলযার বানায়া হোগা
(রক্তের এই চিহ্ন যদি পথকে প্রশ্ন করে ফেলে
কে এই বিরান মরুকে ফুলবাগান বানালো?)

'পাকিযা' ছবিটি কামাল আমরোহি বানানোর কাজ শুরু করেন ১৯৫৮ সালে। তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হলো। ছবির কাজ থেমে গেল। তখনো কাজ অর্ধেক শেষ হয়নি। মীনাজি ততদিনে আকণ্ঠ মদে ডুবে গেছেন। ১৯৬৯ সালে সুনীল দত্ত আর নার্গিস সেই ছবির কিছু রিল দেখলেন। তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন, এই ছবি শেষ করতে হবে। দুজনই রাজি হলেন। হিন্দুস্থান টাইমসে সেই ঘটনা ছাপা হয়েছিল:
"মীনা কোন কথা বললেন না। চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরলো শুধু। আমরোহি ছবি আবার শুরুর প্রতীক হিসেবে একটা সোনার গিনি দিলেন মীনা কুমারীকে। বললেন: দেখো, ছবি শুরুর দিনের মতোই সুন্দর দেখাবে তোমাকে"।
চূড়ান্ত অসুস্থ মীনা জানতেন হাতে সময় খুব কম। অমানবিক পরিশ্রমে তিনি তাঁর জীবনের শেষ বিন্দু নিংড়ে দিলেন এই ছবিতে। 'পাকিযা' মুক্তি পেলো ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে। ছবি ফ্লপ। সপ্তাহ না ঘুরতেই হল থেকে নেমো গেলো। এই জগতকে ঠিকই চিনতেন মীনা কুমারী। ছবি মুক্তির দুই মাস না যেতেই তিনি মারা গেলেন। ট্রাজেডি কুইন যে সত্যিকারের জীবনেও তাই ছিলেন জানতে পেরে এবার হল উপচে পড়লো। মীনা কুমারী পেলেন মরণোত্তর তাঁর জীবনের দ্বাদশ আর সর্বশেষ ফিল্মফেয়ার মনোনয়ন। গার্ডিয়ানের চলচ্চিত্র সমালোচক ডেরেক ম্যালকমের মতে পাকিযা তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ একশটি ছবির একটি যা কি না "সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মিউজিক্যাল মেলোড্রামার অন্যতম"।
মাহযাবিন বানো, মীনা কুমারী না কি মীনা কুমারী নায– কেউ একজন লিভার সিরোসিসে মারা গিয়েছিলেন ৩১ মার্চ ১৯৭২ সালে ৩৮ বছর বয়সে। জন্মের পর বাবা তাঁকে এতিমখানায় রেখে এসেছিলেন অর্থাভাবে। মৃত্যুও পরও দেখা গেল নার্সিং হোমের খরচ শোধ করার মতো টাকা নেই।
রাহ দেখা করেঙ্গে সদিও তক
ছোড় জায়েঙ্গে য়ে জাহাঁ তানহা
(বহু শতাব্দী পথ চেয়ে থাকবে
এই পৃথিবীকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে যাবো আমি)

গ্রন্থসমালোচনা

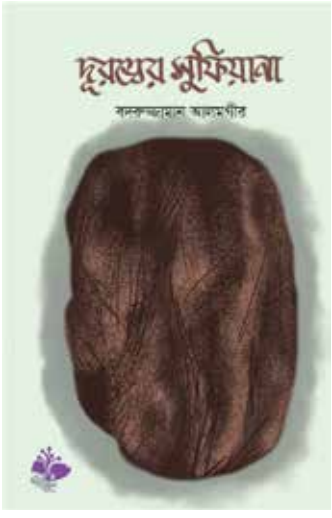

গ্রন্থসমালোচনাঃ

বদরুজ্জামান আলমগীরের কাব্যগ্রন্থ দূরত্বের সুফিয়ানা

কবিতার প্রকাশিত আড়াল

শিবলী জামান

----পাখিগুলো কাফনের চিত্রকল্প পরে ওড়াউড়ি করে, আর
মানুষেরা পাখিদের ঠোঁটে স্মৃতি-বিস্মৃতির দানা খুঁটেখুঁটে খায়।

এমন চিত্রকল্পের ভিতর দিয়েই পথ চলে বদরুজ্জামান আলমগীরের কাব্যগ্রন্থ 'দূরত্বের সুফিয়ানা'। পিচঢালা চকচকে কালো রাজপথে নয়, এ যেন ইচ্ছে পথের চলন– ইচ্ছেই এখানে পথ হয়ে চলে। মানুষ তার বয়সে যতটা বাঁচে স্মৃতিতে তার হাজারগুন বেশি। স্মৃতি-বিস্মৃতির টুকরো কুড়িয়ে পথ চলে জীবন। আত্মসন্ধান, আত্মপরীক্ষা, দুঃখ, রোগ, প্রেম, মত্ততা, ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময়ের মধ্য দিয়েই কবির পথ চলা। পূর্বের পথ থেকে, ভাব ও ভাষা থেকে, সুর ও স্বর থেকে অর্থাৎ কবির পূর্বের লেখা থেকে এই লেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পথ এখানে অচেনা হলেও কবির অজানা নয়। এখানে কবির কণ্ঠস্বর নোতুন, বাচনভঙ্গি কোমল, কৌলিন্য বা ক্লাসিক শিল্প চেতনার পরিবর্তে এখানে আছে এক সদ্য জেগে-ওঠা আত্ম-চেতনা।
"---জীবন এমনই– কাঠ ঠোকরার ঠোঁটে নিজেরই খানিকটা রক্ত, আমরা মনে করি পলাশ ফুটে আছে!"
মূলতঃ জীবনের রঙেই শিমুল-পলাশ রঙ ছড়ায়, প্রভাত-গোধূলি রাঙিয়ে দেয় কবি-মনের আকাশ। ভাবনার হাসি-কান্নায় প্রাণের সুইয়ে রচিত হয় নকশী কাঁথার মাঠ; আর–
"--মেঘের সিন্দুক থেকে ঝরঝর করে নেমে আসে
বৃষ্টির সহস্র কূশিকাঁটা।"

কবির প্রকাশিত অন্যান্য কবিতার সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলেই সেগুলো থেকে 'দূরত্বের সুফিয়ানা'র তফাৎটা ধরা যায় সহজেই। পার্থক্য শুধু এই নয় যে দূরত্বের

সুফিয়ানায় কবির ভাষা ও ভঙ্গি অনেক বেশি ঘরোয়া, বরং গভীরতর পার্থক্য এখানে যে- কবির আগের চিত্রকল্প ও উপমা ছিল কিছুটা বা অনেকাংশেই বর্ননাধর্মী; আর এখানে উপমা উপমেয়র বিষয়ে যতটা বলে কবির আত্মার বিষয়ে বলে ততোধিক। তাই তো আবেগের নিবিড়তম মুহূর্তেও উচ্ছ্বাসের হাতে ধরা দেননা তিনি, কবির উপরে কবিতাকে স্থাপন করেন অত্যন্ত নির্মোহ ভাবে। তাইতো নিরুপমা পিসিমা–

"----কাহার তরে জানি
মায়াপাত্রে জ্যোৎস্না তুলতে দরজার দিকে যান। পিসিমা
ভুলে যান, কবেই ওই দরজা আদিঅন্তকালের জন্য বন্ধ
হয়ে গ্যাছে!

পিসিমা নির্বিকার। নিরুপমা পিসিমা এভাবেই ভগবান
হয়ে ওঠেন।"

আঁখি মুঞ্জিয়া কবি দ্যাখেন–
"---- বিধাতার পরাগ মানুষে গোপন
মানুষ লালন করে আদি মন্ত্রের দোলানো পর্দা।
অন্ধকারই আলোর সুফিয়ানা, অন্তর্গত সংবিধান।"

বদরুজ্জামান আলমগীরের এই 'অন্ধকার' শুধুমাত্র কালো আঁধার নয়, এ যেন নিজেকে দেখার এক হিরন্ময় আলো। এই আলোকপ্রাপ্তরা-ই সন্ধান পান কবিতার, ধীরে ধীরে হয়ে উঠেন 'দ্রষ্টা'– অদৃশ্যকে দেখার, অশ্রুতকে শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পথ চলতে শুরু করেন। একজন কবির কবি হয়ে উঠার পূর্বে তাঁকে অবশ্যই 'দ্রষ্টা' হতে হবে, 'বক্তা' বা 'প্রবক্তা' নয়। বিশ্বজগতের লুক্কায়িত সম্পর্কগুলোকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করাই তাঁর কর্ম, স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত ও বিনীতভাবে আত্মসমর্পন করাই তাঁর ধর্ম।
কবিতার সঙ্গে নিবিড় বসবাবাসের কল্যাণেই কবি বলতে পারেন–
"---কখনো কখনো জীবনে অসুখী হয়ে ওঠাও একটি ইবাদত
ও অন্তর্গত কৃষিকাজ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো বা জীবনানন্দ দাশের প্রার্থনার
এই ভঙ্গিটি বুঝতে পারেন নি।
কেন চাই- সব বেতফল, সকল মেঘদল বৃষ্টির লিরিকে মিলিয়ে হারাক!"

এমন শুদ্ধ, সংহত এবং নির্ভীক উচ্চারণ সুস্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দেয় দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির কথা, কিংবা–

"কোন যে ব্যথার সোয়াবে খোয়াবে
জল কাপে তিরতর

কার্পাস তুলো কেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডোবে
বলো তার তাফসির!"– এই অনুসন্ধানের অন্বেষাতেই বদরুজ্জামান আলমগীর আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর,অথবা–

"--তামাম দুনিয়ার বিশালতার পাশে
আমার দুটি চোখ কতই না ছোট!"

বিনাপ্রশ্নে কবির এ আত্মসমর্পণ সত্যিই কবিকে বড় করে তোলে।

কঠিন ছন্দোবন্ধের সঙ্গে ভাষার নির্ভার মৌখিকতা, আর মৌখিকতার সঙ্গে অভিজাত শুদ্ধতাবোধ, মিল ও স্তবক বিন্যাসের নৈপুণ্য, যতি চিহ্নের অভুতপূর্ব ব্যবহার গ্রন্থটিকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছে।'আদমসুরত' কবিতাটি লক্ষ করি–

"কুমিল্লা খদ্দরে মোড়ানো রাতের তমসা আর দোটানা,
তুমি রেহেলে তোল কোরানি কালাম, প্রাণের জোছনা।
তোমারে, ওগো দখিন হাওয়া লাগে কেন ব্যর্থ মনোরথ,
রেহেলে খোঁজো কেমন এক ঢেউ হারানো আদমসুরত!"

আবার 'জলের জরুল' কবিতায় দেখি–
"---প্রথম হাওয়ায় দেবদারু বন নড়ে
দূর গ্রাম কাপাশিয়া
আমের শাখায় মুকুল কথাটি ধরে
শাহ জালাল আউলিয়া।"

দূরত্বের সুফিয়ানায় কবি তাঁর চৈতন্যের ভাব-ভাবনাকে উন্মোচন করেছেন সরলতার সঙ্গে সহজ কথায়। আপন আত্মার এই অনাবরন উন্মোচনের মধ্য দিয়েই কবি সন্ধান করেছেন পরমাত্মার, আবিষ্কার করেছেন মানবাত্মার বহুস্তর। ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পণ এই বিরোধী ভাবনাগুলো পরস্পর সংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিরন্তর দুই যুগপৎ আসক্তি কাজ করে যাচ্ছে– একটি ঈশ্বরের প্রতি অন্যটি শয়তানের প্রতি। ঋণপত্র কবিতাটি দেখি–
"আমার পয়ার কোমল অগ্নি তৃষ্ণারঙিন দিন
তোমার তনুর জায়নামাজে পদ্মা গাঙের মীন।
অন্ধ ঢেউয়ের তসবি দানা নির্বাণে হয় ঋণী
প্রথম ওঙ্কার তোমার লাগি মরণ নিঙড়ে আনি।"

আবার 'দেহের ঝনৎকারে' দেখি–
"আগাগোড়া হিজাব পরে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো হয়ে থাকা আর

অতি স্বল্পবসনা একজন নারীর মধ্যে মৌলে কোন তফাৎ নাই;
দুটোরই ভাবের, বাস্তবের কেন্দ্রে শরীর, শরীর।"

দূরত্বের সুফিয়ানা কবির পথ পরিক্রমার গল্প। পথ চলতে চলতে এই কাব্যে এসে কবি তাঁর কবিতাকে তুলে এনেছেন নোতুন এক পথে, যে পথের দেখা তাঁর আগের খুব বেশি কবিতা পায়নি। যদিও বদরুজ্জামান আলমগীরের প্যারাবল গুলোতে মাঝে মাঝে পথ বদলের ইংগিত ছিল। কবি সবসময় বর্তমানে থাকতে চান–

"---অতীত আর ভবিষ্যৎ-
এ দুইয়ের যোগফলই তো জীবন।
না, তা জীবন নয়, এ হলো উপরে ওঠা, নিচে নামা।
আমি বলছি থেমে থাকার কথা- বর্তমানের কথা।
তাহলে বর্তমানকে কিভাবে পাওয়া যায়?
আমরা যদি অপেক্ষা করতে জানি-
তাহলেই কেবল বর্তমানকে পেতে পারি।"

খাঁটি শিল্পের দর্পনে প্রতিফলিত জীবন। যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়-পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনের সবকটি দিক খাঁটি শিল্পে প্রতিফলিত হয় যা কখনো জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যে ধারণা দেয় না। কবিতার, গদ্যের কার কথা বলবার ভাষার মধ্যে কবি কোন ভিন্নতা স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন– যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, অনাড়ম্বর। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সকল উপাদান। কবি যখন লেখেন, কথা বলেন কিংবা অস্ত্র হাতে নেন তিনি একই ব্যক্তি। কবি হলেন জীবনের সঙ্গে যুক্ত– জীবনের সংগঠক। তাইতো মন্ত্র না জানিয়া কবি বলেন–
"তিন হাঞ্জায় পুরান ঢাকার এক খুপরি ঘরে
দুই ভাই মিলে চা খাই পিয়া পিয়া আহারে
বটগাছের দুটি পাতা আৎকা উঠিলো কাঁপিয়া
না চিনিয়া না বুঝিয়া কই নিজামুদ্দিন আউলিয়া!"

আবার নিসর্গের নুন সিরিজে দেখি–
"ভাদ্র মাসের চান্নিঃ ভাদর মাইয়া শিহরণ এমন
যার দিকে চাইলে সবকিছু এমন দুর্নিবার সরব,
নিঃসঙ্গ আর প্রাণময় লাগে যে আমরা অন্ধ হয়ে যাই;
তোমাকে না পাওয়ার করাতকল, আর পাবার ডুবসাঁতার
রুদ্রাক্ষের মালায় আমি সন্যাসী গৃহীর গলায় পরে নিই;
আর তোমার বাজুবন্দ খুলে খুলে যায়!"

দূরত্বের সুফিয়ানা বৈচিত্রময় বৈচিত্রে ভরপুর। এতে রোমান্টিকতা, আধ্যাত্মিকতা,

কৌলিণ্য আর আধুনিকতা মিলেমিশে আছে। তুমুল উচ্ছ্বাস যেমন এতে আমরা দেখিনা তেমনি পাইনা দুর্বোধ্যতা। প্রতিটি কবিতা প্রাঞ্জল, ঘন ও গভীর,আকারে ক্ষুদ্র হয়েও ইংগিতে দূর-প্রসারী। আমারা যদি 'ঘোরার্তি' এবং 'চিত্রাহরিণ ও বাইসন' কবিতাটি দেখি তাহলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুটি কবিতাই তুলে দিলাম:

ঘোরার্তি
ঘুরে আসি রাধাপুর কৃষ্ণতলা থেকে
হাতপাখা দ্বিধাঘোর শেওলার দিকে;
দেখা হলো যার সাথে কথা হলো না
কথা হলো তার সাথে দেখা হলো না!

চিত্রাহরিণ ও বাইসন
আগে বুকে ব্যথা হলে ভাবতাম– কোথাও এক
চিত্রাহরিণ একটি মোরগ ফুলের কাছ ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে আছে;
এখন বুকে ব্যথা হলে ভাবি– জানালা ভেঙে
আমার ধুলামলিন
একখানি কুপিবাতি তছনছ করে দিতে
হুড়মুড়িয়ে কোথাও একটি বাইসন বুঝি দৌড়ে আসে।

প্রথম কবিতায় রোমান্টিক জানা-অজানার জাল আর দ্বিতীয় কবিতায় সুররিয়ালিজমের এমন ক্লাসিক বুনন আমরা কেবল বদরুজ্জামান আলমগীরেই দেখতে পাই।
আবার 'কবি এমন', 'কবিতার কাজকর্ম', 'কবির মাতৃভাষা' এই লেখা তিনটি পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে আমরা একটা ট্রিলজি দেখতে পাই সহজেই।
বদরুজ্জামান আলমগীরের কবিতা আরো বিশাল ক্যানভাসে আলোচনার আশা রাখি, সত্যি বলতে কি 'দূরত্বের সুফিয়ানা' সে দাবীও রাখে। তাই শেষ করছি এই বলে–
"আমরা এনেছি পাতা
আর বাতাসের কানাকানি,
লতায় ফুটেছি নাকফুল
আর সুরের রাহাজানি।"

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিত ই-বই:

শাহবাগ মন উদ্বাগ : ইচক দুয়েন্দে

দূরত্বের সুফিয়ানা : বদরুজ্জামান আলমগীর

এগারো সিন্দুর : রফিক জিবরান

তিন ডানাওয়ালা পাখি : রফিক জিবরান

পিপাসার জিনকোড : সাদাত সায়েম

মাটির উনুন ও যুবকের ওম : সৈয়দা হাবিবা

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিতব্য ই-বই:

বইগুলো পেতে ভিজিট করুন:

www.bhatful.com